তৃতীয় অধ্যায়

(অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ঃ বহমান সময়ের চলচ্ছবি)

রহু চণ্ডালের হাড়

এক

সময়কে এড়িয়ে গিয়ে কোনো সৃষ্টি হতে পারে না বা বলা চলে সময়েরই সৃষ্টি সবকিছু। মানুষের চরিত্র থেকে শুরু করে সাহিত্যিকের রচনা সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে সময় ও পরিসর। উনিশ শতকের যে সময়ে বাংলা উপন্যাস তার যাত্রা শুরু করেছিল যে সময় থেকে আজকের এই একবিংশ শতকে পৌঁছে বাংলা উপন্যাস বদলে গেছে আগাপাশতলা বা বলা চলে তাকে বদলে দিয়েছে সময়। ঔপনিপেশিক শাসকের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, তাদের মডেলে উপন্যাস গড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে। তা সত্ত্বেও, আমরা দেখি, চিন্তা জগতের স্থবিরতা, দু'শো বছরের বন্দীত্বের জড়তা কাটাতে কাটাতে বয়ে গেছে দীর্ঘ সময়। মূলত সত্তরের দশকের ঘটনাবলীই বাঙালির চিন্তা জগতে নতুন করে আলোড়ন তোলে তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। এই দশকই সৃষ্টি করে নতুন এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক যারা ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলকে নিজের মত করে ভেঙে নিলেন, অস্বীকার করলেন 'কাহিনির মায়াকে'কে, উপেক্ষা করলেন পণ্যসাহিত্যের সহজলভ্য হাতছানিকে। তাঁদের লেখার উঠে এল দেশজ কথকতার ধরন, বিভিন্ন মিথ আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁদের উপন্যাসে প্রান্তবাসী খুঁজে পেল তাদের নিজস্ব স্বর। তবে এমন অবশ্যই বলছি না যে, সত্তরের পরে রচিত সব উপন্যাসই আত্মজিজ্ঞাসা ও সময় জিজ্ঞাসায় সমৃদ্ধ আর একথাও অস্বীকার করছি না যে, এই দশকের আগেও আমরা পেয়েছিলাম অনেক মহান উপন্যাস—ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই আছে। তবে, সাধারণভাবে বলতে পারি সত্তরের ঘটনাবহুল সময়ই জন্ম দিয়েছিল সাহিত্যের বিশেষ উপন্যাসের এক নতুন ধারার। এই নতুন ধরনের উপন্যাস কেবল 'কৃশকার মধ্যবিত্ত বাঙালির তরল ও পানসে দুঃখবেদনায় পাঁচালি' ছিল না। এই উপন্যাসের মূল অন্বিষ্ট ছিল শিকড়ের সন্ধান-'দেশ, মানুষ, জাতীয় সংস্কৃতির গোড়ায় গিয়ে শিকড় সন্ধান'—'সেই শিকড় সন্ধান, যা বিশ্বসাহিত্যের মূল স্পন্দনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগকে চিহ্নিত করে দিয়ে যায়।'

এই শিকড় সন্ধানী লেখকদের অন্যতম অভিজিৎ সেন। বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে স্বাধীনতার দু'বছর আগে তাঁর জন্ম হয়। দাঙ্গার গুজব, আতঙ্ক ও হিংস্র চেহারার সঙ্গে তাঁর রয়েছে প্রত্যক্ষ পরিচয়। আট ন'বছর বয়সে মা-বাবা, পরিচিত পরিবেশ জন্মভূমি ছেড়ে আসার বেদনা তিনি জানেন। গ্রাম থেকে শহরে বিশেষত মহানগরে আসা একটি প্রায় চালচুলোহীন মানুষের বিষন্ন একাকীত্ব তিনি ভোগ করেছেন। যেমনটা ঘটেছিল আরো এক বরিশালে জাত কবির ক্ষেত্রে। আঠারো বছরের সেই সদ্যতরুণ কলকাতায় এসে তাঁর অতীত ভুলতে পারেননি, লিখেছিলেন—

> 'দেশের বাড়ির এই মাঠ প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার ডাকে ভরা রহস্যময় রাত, পথপ্রান্তর — মানব-আত্মাকে অনেকদিন পর্যন্ত নিবিষ্ট করে রাখতে পারে। ... চারিদিকে এই আম কাঁঠাল লেবুর বন, জঙ্গল মাঠ নিস্তব্ধতা ... এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।' ১

অভিজিৎ সেনের মহানগরে এসে পড়ার বিপন্নতাবোধ, গ্রামের ছায়াঘেরা শৈশবের প্রতি স্মৃতিমেদুরতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ধীরে ধীরে পেয়ে বসা কলকাতার নেশা। তার পরেই এল সত্তরের দশকের সব কিছু ওলোট পালট করে দেওয়া ঝড়। সেই ঝড় তাকে আবার পৌঁছে দিল গ্রামে। চাকরি, ঘর ছেড়ে পেশাদারিভাবে যোগ দিলেন আন্দোলনে। পরবর্তীকালে সমবায় ব্যাংকে চাকরির সুবাদে গেছেন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায়, প্রত্যন্ত গ্রামে—দেখেছেন বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গার বাস্তব রূপায়নের চেষ্টা ও তাকে ঘিরে উদ্ভুত পরিস্থিতি। তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না আজকের সমাজের পচন, ঠিক তেমনি তিনি জানেন, আমাদের ইতিহাসেই লুকিয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষত, যেগুলি এখনও বিষিয়ে চলেছে। জীবনানন্দ দেখেছিলেন—

> 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
> যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
> যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
> প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' ২

অভিজিৎ দেখেন এ অবস্থা আজও বদলায়নি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অতীত ও বর্তমানে সমানভাবে সঞ্চরণশীল থাকে। সত্তরের জাগ্রত বিবেক নিয়ে তিনি সময়ের খনন কার্য চালিয়ে যান। অভিজিৎ

সেনের লেখালেখি নিয়ে অমিত মণ্ডল লিখেন—

> ‘তিনি রক্তের উষ্ণতা দিয়ে জীবন রাঙান, তিনি জীবন পুড়িয়ে সত্যের সুষমা আবিষ্কার করেন, তাঁর কলম বিস্তীর্ণ মানব-জীবনকে শিল্পে উত্তীর্ণ করে। পাশাপাশি এটাও মান্য, লেখকের যাপিত সময়ের অভিজ্ঞতার চাপ তাঁর সৃজন মুখরতার অন্তরঙ্গ সুজন, সময়ের গভীরের অজস্র টানা পোড়েন লেখককে জাগিয়ে রাখে নিরন্তর আর একজন সৎ লেখকের সৃষ্টিকর্মে তার প্রতিফলন, তা যে যত খণ্ডিতই হোক না কেন, পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। অভিজিৎ সেন সেই ধারারই একজন যাঁর অভিজ্ঞতা জীবনবোধ আর শিল্পজ্ঞান মিলে মিশে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয় আর মননঋদ্ধ পাঠক পণ্যসাহিত্যের ভিড়ের মধ্যে মুক্তির আনন্দে ডানা ঝাপটানোর রসদ খুঁজে পান।’[৩]

দুই

অভিজিৎ সেনের বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ (১৯৮৫) এক যাযাবর গোষ্ঠীর কয়েক প্রজন্ম ধরে চলে আসা আত্মপরিচয় সন্ধানের সংগ্রাম কাহিনি, গৃহস্থ হবার স্বপ্ন দেখার ও স্বপ্ন ভাঙার কাহিনি। কয়েক প্রজন্ম ধরে বর্ণিত উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই আমরা পেয়ে যাই সেই সময়ের রাজমহল, রাজশাহী, মালদা প্রভৃতি এক বিস্তীর্ণ এলাকার রাজনৈতিক সামাজিক ইতিবৃত্ত। দেখি মূল্যবোধের পরিবর্তন, চিন্তাজগতের বিবর্তনের ছবি। মিথ, ইতিহাস ও বর্তমানের নক্সীকাঁথা যেন বা হয়ে ওঠে এই উপন্যাস। অভিজিৎ নিজে ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটার সম্বন্ধে একটি সাক্ষাৎকারে জানান—

> ‘রহু চণ্ডালের হাড় শুধু যাযাবরদের জীবন সংগ্রামের কাহিনিই নয়। যাযাবরদের এক-দেড়শো বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে একটা বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসাবাণিজ্য, রাষ্ট্র- ইত্যাদি বহু বিষয়কেই টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।’[৪]

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একবার একটি প্রবন্ধে কবি ও কথাসাহিত্যিকের কাজের

পার্থক্য ধরিয়ে দিতে গিয়ে লিখেছিলেন যে যদিও উভয়েরই কাজ ব্যক্তির স্বরূপসন্ধান বা ব্যক্তির উন্মোচন, কিন্তু কবি কেবল নির্যাসটিকে প্রকাশের দায়িত্ব নেন, অপরপক্ষে কথাসাহিত্যিকের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেশি, অনেক বিস্তৃত। সেই দায়িত্বের গুরুভার বহন করা অনেকসময় ক্লান্তিকর, অস্বস্তিকর বা অপছন্দের হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কবির মতো এককথায় কোনো কিছুকে বাতিল করতে পারেন না। তাঁকে জীবন সম্পর্কে গভীর বোধটিকে আখ্যানে রূপ দিতে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার অনেক খুঁটিনাটি উপকরণকে জেনে এগোতে হয়। তাই তাকে জানতে হয় মানুষের জীবনযাপন, তাদের স্বভাবধর্ম। আবার একক ব্যক্তিও কথাসাহিত্যিকের অন্বিষ্ট নয়। স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে ব্যক্তির বিচরণ ক্ষেত্র সমাজ। ফলে কোনো কথাসাহিত্যিকের পক্ষে কোনো কিছু নিয়ে লিখতে শুরু করার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতোই কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বা পড়াশোনা। বিশেষ করে অভিজিৎ সেন যখন যাযাবরদের মতো এক প্রায় অপরিচিত জনগোষ্ঠী নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, তখন প্রশ্ন জাগতেই পারে তাঁর তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কতটুকু? আর বিশেষত এ প্রশ্ন উঠতে পারে তার আরো একটি কারণ হল, আমরা লক্ষ্য করেছি, দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সাহিত্যে এজাতীয় নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান রচিত হয়েছে সেগুলির কোনোটিতেই এই নিম্নজনেরা তাদের যথার্থ আড়েদীঘে উঠে আসেনি। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', তারাশঙ্করের 'নাগিনীকন্যা' বা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতিতে যথেষ্ট তথ্যানুপুঙ্খতা সত্ত্বেও রোম্যান্টিক উপন্যাসের উপকরণও অনুপ্রবেশ করেছে। অর্থাৎ যেমনটা আছে তেমনটা নয়, যেমন হলে দেখতে ভালো দেখায় তেমন। এমনকি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর ঢোঁড়াই লেখকের পরিচিত লোক হওয়া সত্ত্বেও সতীনাথ ভাদুড়ি লিখতে বসে তাকে বদলে নেন। লেখক নিজে বলেছেন—

> 'আমার কাজ হল ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে। ...এজন্য ঢোঁড়াইয়ের স্বভাবের মারাত্মক ত্রুটিগুলো বেমালুম চেপে যেতে হল।' [৫]

তাই আমরা বিনা প্রশ্নে সূচাগ্র স্থান ছেড়ে দিতে রাজি নই। প্রাথমিকভাবে আমরা দেখে নিতে চাই অভিজিৎ সেনের ব্যবহৃত তথ্যাবলী যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে কি না এবং মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক ভাবপ্রবণতার প্রবেশ ঘটেছে কি না। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে 'নিম্নবর্গ' বা 'নিম্নজন' বলে কাদের বোঝানো হচ্ছে। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'আবহমান কাল ধরে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যারা ব্রাত্য, মন্ত্রহীন,

অপাঙ্‌ক্তেয় এবং বর্ণাশ্রম প্রথার নিরিখে অন্ত্যজ অন্তেবাসী, সেইসব নিরন্ন ক্ষুৎ-পিপাসাক্লিষ্ট অসহায় গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষই নিম্নবর্গ। ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ও সম্ভাব্য উত্তরণের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকেই চিরনির্বাসিত প্রত্যাখ্যাত 'অপর'। এদের মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত জল-অচল অস্পৃশ্যেরা, কৃষিমজুর ও ভূমিদাসেরা; রয়েছেন সব ধরনের জীবিকাহীন ভাসমান মানুষেরা। এককথায় গ্রামে-গাঁথা-দেশের বিপুল সংখ্যক নিরালোক-বন্দি অভিব্যক্তিহীন প্রান্তিকায়িত মানুষেরাই বাংলার নিম্নবর্গ। এবং বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে পিতৃতান্ত্রিক পিঞ্জরে রুদ্ধ নারীসমাজকেও নিম্নবর্গের পরিধিভুক্ত করা চলে।[৬]

এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখে এখন আমরা অনুসন্ধান করব 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অভিজিৎ সেন এই নিম্নবর্গকে কতটা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, চাকরি সূত্রে অভিজিৎ সেন দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছিলেন। আর ফলে ওইসব অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনা, জীবনের বিভিন্ন ছবি ছিল অনেকটাই তাঁর নিজের দেখা—চাকরিতে থাকার সময় বেশ কাছ থেকে দেখেছেন বাজিকরদেরও। তাঁর নিজের ভাষায়—

'১৯৭৩-৭৪ সালে একবছর তিনচার মাস সময়ের জন্য আমি তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের একটি সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেছিলাম। সেইসময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে এই বাজিকরদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। মাঝখানে কয়েকবছর বাদ দিয়ে ১৯৭৬-১৯৭৭ সাল থেকে ফের বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল আমার। বেশ কয়েকবছর এদেরকে কাছ থেকে এবং দূর থেকে দেখার পুঁজি সম্বল করে 'রহু চণ্ডালের হাড়' লেখার কাজ শুরু করি খুব সম্ভবত ১৯৮০ সালের কোনো এক সময়।

বালুরঘাটের তপন থানা হচ্ছে জেলার সব থেকে দরিদ্র অংশ। জমি এখন পর্যন্ত প্রায় সবই এক ফসলি। রুক্ষ কাঁকর মেশানো মাটি। মাটির নীচে জল নেই। পানীয় জলের কুয়োও মাঘ-ফাধনে শুকিয়ে যায়। আদিবাসী এবং তপশীলি প্রধান এই থানার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে এই বাজিকরেরা পড়ে।

বাজিকরদের একটি দল সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় যখন মুসলমান হওয়ার সংকল্প করে, সে পর্যায়টা আমি ভালোভাবে খেয়াল করেছিলাম।

বাজিকরদের থিতু হবার পুরো প্রক্রিয়াটা সেই সময় আমার মাথার রূপ্‌ পেতে শুরু করে।’[৭]

বাজিকরদের জীবন সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া যে সমস্ত বই এবং তথ্যাবলী তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল সে সম্বন্ধেও লেখক জানান—

‘...... যাযাবরদের বিষয়ে খোঁজ খবর, ওদের নিজেদের কাছ থেকে স্থানীয় প্রবল দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে এবং বালুরঘাটে পাওয়া সম্ভব এমন কিছু বইপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম। জেলা লাইব্রেরিতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছিল। যেখান থেকে যাযাবরদের বিষয়ে যা পাওয়া যায় এবং আমার যতটুকু প্রয়োজন লাগে ততটুকু সংগ্রহ করেছিলাম। যাযাবরদের বিষয়ে বাংলায় সেই সময়ের একমাত্র বই শ্রীপান্থের জিপসির পায়ে পায়েও একবার পড়ে নিয়েছিলাম। পড়েছিলাম রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস বই থেকে আঠারো উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাদেরও খানিকটা। ১৯৮০-১৯৮১ সালে পশ্চিমদিনাজপুরে কর্মরত অসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত আই. এ.এস. মশাইয়ের সহায়তায় আমার উদ্দিষ্ট সময়কালে লিখিত দিনাজপুর এবং রাজশাহির জেলা শাসকদের পরস্পরকে লেখা কিছু চিঠি পড়ারও সুযোগ হয়েছিল। এইসব নিয়েই আমার রহু চণ্ডালের প্রচেষ্টা।’’[৮]

অর্থাৎ যে সমস্ত সূত্র থেকে অভিজিৎ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এর জন্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য। বিশেষত তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাই রয়েছে যথেষ্ট। আর সত্তরের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যে নতুন এক লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা সাহিত্যে নিয়ে আসতে চেয়েছেন নিখাদ নিম্নবর্গীয় চেতনা। অভিজিৎ তাঁদেরই একজন। তাঁরা দেখছিলেন সাহিত্যে এতকাল যা চর্চিত হয়েছে তা হল উচ্চবর্গের কাহিনি। এমনকি নিম্নবর্গীয়রা যখন এসেছে তখনও তাঁরা এসেছে উচ্চবর্গের কল্পনার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে নিজেদের কাট ছাঁট করে। ফলে যা বাস্তব বলে প্রদর্শিত হয়েছে তা ছিল অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। পরিচিত বাস্তবের আড়ালে রয়ে যাওয়া সেই গভীরতর বাস্তবকে আখ্যানে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন এই কথাকারেরা। সমালোচক তথা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

‘পরিচিত বাস্তবের অন্তরালে অন্য এক গভীরতর বাস্তব উন্মোচিত হতে লাগল। উপনিবেশোত্তর চেতনাও পাশাপাশি মুকুলিত হচ্ছিল। উপন্যাসের প্রতিবেদন মানববিশ্বের সম্পূর্ণ অবয়ব আবিষ্কার করার জন্যে অন্তেবাসীদের প্রান্তিকায়িত

জীবন থেকে কখনো আহরণ করল ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার উপকরণ, কখনো বা পরা-বাস্তবের দ্যোতনা, কখনো সামাজিক ও রাজনৈতিক অবচেতনের কূট দ্বিরালাপ।'[৯]

'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর নিবিড় পাঠ আমাদের বাধ্য করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে এ কেবল চাঁদের উজ্জ্বল পিঠের ছবি নয়, অন্ধকার পিঠেরও ছবি। ধর্ম, দেশের গণ্ডিকে নসাৎ করে দিয়ে ভিখ মাঙ্গার কাজ করেও সগর্বে যারা বাঁচত তারা স্থায়ীত্বের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। তারা স্থায়ীত্ব চেয়েছে কারণ পথের জীবনও নিরাপত্তা হারিয়েছে। আর এই নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টিকারী হল মানুষই—সেই মানুষেরা যারা উচ্চবর্গীয়। রণজিৎ গুহ যাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

'......ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু-ভাগে ভাগ করা যায়—বিদেশি ও দেশি। .....দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু-রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতা বিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর একরকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলো আনাই আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী করে না।'[১০]

যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠী যেমন পথে পথে এই উচ্চবর্গীয়দের হাতে নিপীড়িত হয়েছে, তেমনি অত্যাচারিত হয়েছে স্থায়ী বসতি স্থাপনের চেষ্টায়। সালমার মতো নিরক্ষর ব্যক্তিও তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে শোষক ও শোষিতের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান হতে পারে না। তাই সে পীতেমের স্থায়ীত্বের স্বপ্নকে ব্যক্ত করে বলে—

'কোন মানুষটা হবি তুই? দয়ারাম ভকত, না তার ওই বাঁধা চাকরটা যার ঘাড়ের উপর পা রেখে ভকত ঘোড়ায় উঠল?'[১১]

এই উচ্চারণের মধ্যে ফুটে ওঠে নিম্নবর্গের প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদের সুর ও এখানেই পার্থক্য। আজকের ব্যতিক্রমী কথাকারদের সাহিত্যে যখন প্রান্তিকায়িতরা আসে তখন তারা প্রতিষ্ঠান অনুগত, প্রশ্নশূন্য, শাসকবর্গের ভাবাদর্শের মায়ায় মোহিত কিছু নির্বাক জনসমষ্টি হিসেবে আসে না, তারা আসে অপ্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি মতাদর্শ ও প্রতিবেদনের ধারক ও বাহক হিসেবে, তৈরি হয় পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। 'রহু

চণ্ডালের হাড়' এ আধিপত্যবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের বিপ্রতীপ স্বর দিয়েই যে নির্মিত তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। রহু-র যে পুরাকথা উপন্যাসটির একটি প্রধান সূত্র তাতেও দেখি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

রহু তার গোষ্ঠীর সঙ্গে যে অঞ্চলে বাস করত সে অঞ্চলে ছিল শস্য শ্যামলা। জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। তারপর একদিন সেখানে এক ভিন্ন জাতীয় লোক এসে রহুর সেরা ঘোড়া অধিকার করল এবং কথা না শুনার অপরাধে সেটিকে হত্যা করে। রহু কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর সেই মানুষটি সদলে এসে সম্পূর্ণ অঞ্চলটিকেই নিজেদের অধীনস্ত করে নিয়ে রহুর গোষ্ঠীকে ব্রাত্য, অস্পর্শ হিসেবে ঘোষণা করে। রহু এতদিন কোনো প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ না করার ফল হিসেবে রহুর গোষ্ঠীকে আগন্তুক দল এভাবে কোণঠাঁসা করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পবিত্রনদীর অধিকার হারানোর পর রহু প্রতিবাদ করল। তবু প্রতিরোধ গড়ে না তোলার ফলে তারা দিন দিন হীনবল হতে থাকল এবং একদিন দেখা গেল বহিরাগতদের যাবতীয় ভ্রষ্টাচার তাদের দলেও প্রবেশ করেছে। তখন রহু বাধ্য হল এই অসম্মান ও অধঃপতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সংগ্রামের নামতে। নদীর অধিকার হারিয়ে জীবনযাপনে যে মালিন্যের শৈবাল জমেছিল তাকে ধুয়ে ফেলার জন্যে প্রথমেই তাই তাদের প্রয়োজন ছিল নদীর অধিকার পুনর্লাভের। রহু ও তার স্বল্প সংখ্যক অনুগামী শিঙ্গাধ্বনি করে এগিয়ে চলল নদীর দিকে। কিন্তু পথরোধ করে দাঁড়াল প্রথম দিনের আগন্তুক। সে খড়্গাঘাত করল রহুকে —

> 'তার দেহ ছিটকে পড়ল সেই নদীতেই এবং প্রবল গর্জন করে তার অনুগামীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে তার দেহকে অধিকার করতে। রহুর ক্ষত থেকে জলস্তম্ভের মতো উচ্ছ্রিত হতে লাগল রক্ত এবং সেই রক্তের প্রবল বন্যায় নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী, দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস করে ধ্বংস করল। কেবল রহুর অনুগামীরা তার দেহকে আশ্রয় করে ভেসে গেল দূর দূরান্তে।' [১২]

জলের এই উচ্ছ্বাসে যেন চিহ্নায়িত হয়েছে রহুর অনুগামীদের বিদ্রোহ। যে প্রবল প্রতিরোধে বিনষ্ট হচ্ছে অত্যাচারী শোষকদের সর্বস্ব। এই মিথের মধ্য থেকে যে সারমর্মটি উঠে আসে তা হল নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির সামনে শেষ পর্যন্ত একটাই পথ খোলা থাকে তা হল প্রত্যাঘাত। এমন নয় যে তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে সবসময় কিন্তু এটিই হল একমাত্র পথ।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিবেদনের প্রতিও তাই উত্থাপিত হয় প্রশ্ন। শারিবা কেবল নিজস্ব অভিজ্ঞতায় নয়, সে তার গোষ্ঠীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রশ্ন তোলে প্রজন্ম লালিত সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাই অঢেল খাবারের বন্দোবস্ত থাকা স্বর্গে মৃত্যুর পর যাওয়ার তার কোনো আগ্রহ নেই। তার মনে প্রশ্ন জাগে সুখ বা

শাস্তি কোনোটিই কেন বাউদিয়া বাজিকরদের কপালে জোটে না। সে প্রত্যাখ্যান করে ভায়রোর মতো সমাজ প্রধানের বিচার। আর কেবল শারিবাই বা বলব কেন সবাই তাদের নিজেদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তোলতে চেষ্টা করেছে। পীতেমরা তাই ঘর্ঘরার তীর থেকে গোয়ালাদের দ্বারা উৎখাত হলে তাদের সবচেয়ে ভালো মহিষ ও ঘোড়া চুরি করে নিয়ে পালায়। সালমা বৃদ্ধ পীতেমকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় নিজের দেহকে হাতিয়ার করে তোলে। জামির মাথা ফাটায় তরমুজের নৌকা উলটাতে আসা দলের একজনের। রূপা অভিনব উপায়ে হত্যা করে ভায়রোকে। এভাবে প্রতিরোধ চালাতে থাকে নিম্নবর্গীয় এই যাযাবরেরা। কারণ পীড়নের বিপরীতে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ থাকেই।

এছাড়া এসেছে যাযাবরদের জীবনের অনুপুঙ্খ। রহুর হাড়ের পুরাকথা, তাদের বিয়ের গান, বিয়ের সঙ্গে জড়িত নানা প্রথা। আবার কেবল যাযাবরদের কথাই নয় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সাঁওতালদের কথাও। বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গও। যে বিদ্রোহের পেছনে রয়েছে পীড়নের ইতিহাস। এভাবে 'রহু চণ্ডালের হাড়' ওঠে হয়ে প্রান্তিকায়িত জনের দীর্ঘ অশ্রুত কণ্ঠস্বর। তাই সমালোচক প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন—

> 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর উপজীব্য হলো প্রত্যাখ্যাত অপর অস্তিত্বের জীবন সন্ধান, যা আসলে শিল্পিত প্রতিবাদ। ছদ্মবাস্তবতার প্রগল্‌ভতা থেকে অনাবিষ্কৃত গভীর বাস্তবতার উপযোগী নব্য আখ্যানে উত্তরণ ওই অপরতার চেতনা ছাড়া সম্ভব হত না। এই চেতনা উপন্যাসের নতুন নন্দনের আশ্রয়ভূমি, একে অবক্ষয়ী আধুনিকতার বিপ্রতীপে উত্তরায়ণ চেতনা হিসেবে শনাক্ত করতে পারি।' [১৩]

আগেই উল্লেখ করেছি যে, সত্তরের দশকে লেখার জগতে প্রবেশ করা এই সময়ের ঔপন্যাসিকেরা সচেতনভাবে উপন্যাস শিল্পের সংস্কার ঘটানো দায়িত্ব নেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমেই যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থিতাবস্থাকে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়ত তাঁরা উপন্যাসে এতদিনের অশ্রুত, অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে তুলে আনলেন। উপন্যাসের চিরাচরিত ধারণা থেকে সরে এসে এক নতুন যাত্রাপথের সূচনা করলেন এই ঔপন্যাসিকেরা। উত্তর আধুনিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনায় আলোকিত এই লেখকরা সেইসব জনগোষ্ঠীর কথা আমাদের জানালেন যা আগে কখনোই যথাযথভাবে আখ্যানে বর্ণিত হয়নি। বিশেষত কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সত্তরের দশকের আগের লেখকদের কাছে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সমস্ত দেশ অলীক হয়ে গিয়েছিল। মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল কলকাতার বাইরে অসংখ্য মানুষের অস্তিত্ব। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক তথা প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুল হক ১৯৭৮ সালে লিখিত 'দুষ্পাঠ্য কররেখা ঙ্খ আমাদের কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে তখনকার পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্য সম্বন্ধে

মন্তব্য করেছেন—

> 'মধ্যবিত্ত যে দিন দিন কোন্ অতলে নেমে যাচ্ছে তার ভয়ঙ্কর চিত্র অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লেখকরা এঁকেছেন। ..বলতে কি এই দক্ষতাতেই পশ্চিমবঙ্গের লেখকরা এখনো লিখছেন, আর লেখার দরকার নেই তবু! ..... এখনো তাঁরা দারুণ দক্ষতা ও নিপুণতা নিয়ে প্রায় এক যান্ত্রিক কৌশলের সঙ্গে এক চমৎকার ছকের রদবদল ঘটিয়ে মধ্যবিত্তের তলিয়ে যাওয়ার, ডুবে যাওয়ার, পচে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার গল্প লিখছেন। ঘুরন্ত চাকার মতো এক ব্যবসায়িক ফাঁদ যেন—লেখকদের বাইরে আসার উপায় নেই—গ্রামে ঢুকেও তাঁদের বেরিয়ে যেতে হয়।' [১৪]

এমনকী, তারপর প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন যে নক্শাল আন্দোলনের মতো প্রবল প্রচণ্ড অভিঘাতও এপার বাংলার লেখকদের কলকাতার বাইরে নিয়ে আসতে পারে না। তাঁর এই অভিযোগের তখন যে অবকাশ ছিল উনিশ শ আঠাত্তর সালে তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চোখ রাখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এ নিয়ে আক্ষেপ আমাদের খুব বেশিদিন করতে হয়নি। দেবেশ রায় ও মহাশ্বেতা দেবীকে দিয়ে শুরু, তারপর ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, নলিনী বেরা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা গ্রাম বাংলায় প্রবেশ করে সেখানকার অদৃষ্টপূর্ব দিকগুলো অশ্রুতপূর্ব কথাগুলো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন কোনো রোম্যান্টিক স্বপ্নীল রঙ ছাড়াই। আবার কেবল গ্রাম নয় বা গ্রামীণ মানুষেরা নয়, তাঁদের উদ্দিষ্ট ছিল সেই প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গীয় মানুষেরা যারা জীবনে সমাজে তো বটেই সাহিত্যেও নিজেদের জন্যে মনুষ্যোচিত সম্মানজনক অবস্থান খোঁজে পায় না।

মহাশ্বেতা দেবী একটি প্রবন্ধে সত্তরের দশকের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা ও নিজের উপন্যাস ভাবনা নিয়ে লিখেন—

> '... সত্তরের দশকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নির্বীযতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ণ বিদীর্ণ হচ্ছিল. সেখানে বাংলা সাহিত্য এতো বড়ো যন্ত্রণার শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরীর দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার ব্যর্থ আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্ত রয়ে গেলো। কেন এমন হলো, তার বিশ্লেষণ করল না কেউ সামগ্রিকভাবে, খুব কম লেখাই সময়ের দলিল হয়ে রইল। ... লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে

দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোনো আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজ জীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্যায়। প্রতিবাদের জন্য চীৎকৃত প্রতিবাদে আমার আস্থা নেই। আমার প্রতিটি লেখাতেই আমি তখনই প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তুলি, যখন প্রতিবাদের প্রেমিস থেকে শুদ্ধতার আরো, প্রয়োজনীয় কোনো প্রেমিসে উত্তরণ সূচিত করতে পারি।"[১৫]

অভিজিৎ সেন নিঃসন্দেহে এই ঘরানারই লেখক। তাই তাঁর লেখার প্রান্তিকায়িত এক বর্গের জীবন কাহিনি সাহিত্যে রূপায়িত হয় সঙ্গে ঘটে সময়ের দলিলীকরণ। আর বর্ণিত হয় অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েও জীবনের চির চলিষ্ণুমানতার কথা।

তিন

অনেকার্থদ্যোতক এই উপন্যাসে কেবল যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনচর্যাই পরিবেশিত হয়নি, এ আখ্যান আসলে 'রূপান্তরিত সভ্যতার রূপকভাষ্য'। নব্য প্রস্তর যুগে প্রথম চাষবাস শেখার পর যাযাবর মানুষের জীবনে এক বড়ো পরিবর্তন আসে। শিকার ও সংগ্রহিত ফলমূলের উপর নির্ভরশীল ভ্রাম্যমান জীবনের ইতি ঘটল কৃষিকর্ম শিখে। এর পূর্বে পশুপালক মানব গোষ্ঠীর পক্ষে কোনোভাবেই এক স্থানে দীর্ঘকাল বসবাস সম্ভব ছিল না। কারণ পালিত পশুর এবং নিজেদের আহার সংগ্রহের জন্যে তাদের স্থান পরিবর্তন করতে হত। সেই সময় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচত। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগে যুগান্তকারী চাষের প্রবর্তন হওয়ার পর মানুষ সঞ্চয় শিখল, সমাজে স্বর বিভাজন এল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল, তার সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমির প্রয়োজন হল, বন ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রকৃতি সংলগ্নতা কমে এল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এ জীবন সব জনগোষ্ঠী একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে কোনো যাযাবর গোষ্ঠী নিজস্ব জীবনধারা ত্যাগ করে একটি সংগঠিত কৃষিজীবী সমাজে প্রবেশের চেষ্টা করলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কৃষি ব্যবস্থা শেখার প্রাথমিক স্তরে খুব কম সংখ্যক মানুষই কৃষিজীবী ছিল। কিন্তু দ্রুত এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং খুব কম জনগোষ্ঠীই রয়ে যায় যারা কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেনি। সে সময় এই পরিবর্তনে সেরকম কোনো অসুবিধা না হওয়ার কারণ ছিল পর্যাপ্ত স্থান অর্থাৎ

মানুষের তুলনায় উর্বরা ভূমির পর্যাপ্ততা। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম যে হত না তা নয়। আবার আধুনিক কালে ভ্রাম্যমান জীবন ধরে রাখাও সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, বিস্তৃত খোলা প্রাকৃতিক পরিবেশ কমে আসছিল। তা সত্ত্বেও বাজিকরদের মতো দু'একটি জনগোষ্ঠী বজায় রেখেছিল যাযাবরী জীবন। কিন্তু পথের জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়াতে তারাও বাধ্য হচ্ছিল কোনো এক জায়গায় স্থায়ী বসতি স্থাপনে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্যে এক বৃহৎ সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এই সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র জোটে কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই, যে যদি বাজিকর, যাযাবর এই জনগোষ্ঠী চাইত নিজেদের পুরোনো জীবনচর্যা বজায় রেখে বাঁচতে তা হলেও তাদেরকে সেই সুযোগ আমাদের সভ্য সমাজ যে দিত না, তা বলা যায় বাজি রেখে। রাস্তার জীবনের বিপদ বাড়ছে বলে লেখক ইঙ্গিত করেছেন সেদিকেই। উপনিবেশবাদ অথবা নয়া উপনিবেশবাদ যাই হোক না কেন সবসময়ই চায় সবাইকে কেটেছেঁটে এক মাপের করে নিতে— স্বাতন্ত্র্য ততটুকুই বজায় রাখা যেতে পারে যেটুকু প্রতাপের স্বার্থে আঘাত করে না। নয়তো কালাহারি মরুভূমিতে বসোবাসকারী পৃথিবীর সর্বশেষ জংলি মানব বলে চিহ্নিত মানুষগুলিকে তাদের বাসস্থান সেড জাতীয় সংরক্ষণাগার থেকে বোতসোয়ানা সরকার কেন বের করে দিতে চায়। সরকার পক্ষ চাইছে তারা লেখাপড়া শিখে তথাকথিত সভ্য হয়ে ওঠুক। সরকারের পক্ষ থেকে জানান হচ্ছে যে কম্পিউটারের যুগে প্রস্তরযুগীয় প্রাণীদের টিকে থাকা অসম্ভব। তাই তারা নিজেদের বদলে নিক অন্যথা তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ হাজার বছরের বাসস্থান ছেড়ে যাওয়ার বদলে তাদের যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা সামান্যই।

আবার বাজিকরদের যাযাবর জীবনের সঙ্গে জড়িত আছে আরো এক মিথ। বাজিকররা অনেক আগে কোনো এক সময় ছিল এক সমৃদ্ধ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। সেই সময় পুরা নামের তাদের এক প্রাচীন পুরুষ পালি নামক এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করে। এই পালি ছিল পুরার বোন। ফলে তাদের উপর নেমে আসে দেবতার অভিশাপ। সব মানুষ অন্তর্কলহে বিনষ্ট হয়। আর পুরা ও পালি দেশ দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। তাদের উপর অভিশাপ ছিল তারা এক বৃক্ষের ফল দুবার ভক্ষণ করতে পারবে না, এক জলাশয়ের জল দুবার পান করতে পারবে না, এক মৃত্তিকায় দুবার পা রাখতে পারবে না। সেই থেকে বাজিকররা নিরাশ্রয়। তাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই, দেবতাও নেই। এই মিথের মধ্যেও আদিম সমাজের বিবর্তনের ধারাটির আভাস পাওয়া যায়, আদিম সমাজে রক্তের সম্পর্ক যৌন সঙ্গী চয়নে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ট্যাবু নির্ধারিত হল—যেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল রক্তের সম্পর্কে যৌন সম্বন্ধের নিষিদ্ধকরণ। বিবাহ প্রথার উদ্ভবও এর সামান্য পরে। পালি ও পুরা এই ট্যাবু লঙ্ঘন করার ফলে সমাজচ্যুত, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। এই প্রাচীন 'স্মৃতি কিংবা পাপবোধ কিংবা নিতান্তই বিশ্বাস' বাজিকররা বহন করে চলেছে দীর্ঘদিন। সালমা আর পীতেম তাই বিয়ে করে না। পীতেম

স্থিতির চিন্তা করলে সালমা ব্যঙ্গ করে। কিন্তু তবু অনুভব তারা দুজনেই করে যে—'বাজিকরেরও আর পালাবার রাস্তা থাকবে না, সব রাস্তা সাহেবরা রেল দিয়ে বেঁধে ফেলেছে।' তাই পীতেম স্থিতি চায়। আর কেবল রাস্তা বেঁধে বাজিকরদের যাবার জায়গা সীমিত হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতি তাদের ঠেলে দিয়েছে ঠিক সেরকম বিবাহ সম্পর্কে যা তারা এককালে গর্হিত অপরাধ হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

> 'কিছু ভীতি অথবা দারুণ দুর্দিনের আশংকা তাদের সমস্ত বিধিহীন জীবনযাত্রাকেও বেঁধে রাখে নিয়মের নিগড়ে।
>
> কিন্তু এই নিয়মের নিগড় থেকে বেগবান অন্য কিছু তাদের একজনকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত রাখত। পীতেম কিংবা সালমা কেউ জানবে না তাদের পরবর্তী তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষেই বিষয়টি নিয়মে পরিণত হবে বাধ্য হয়ে, যে বাধকতায় পুরা ও পালি আনীত অভিশাপ মূল্যহীন হয়ে যাবে।'[১৬]

আর এভাবে লেখক সভ্যতার রূপক ভাষ্যের সঙ্গে তুলে ধরেন বাজিকর নামক এক প্রান্তেবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতাপের হাতে নিপীড়িত জীবন। এভাবে উপন্যাসটি সংগ্রহ করতে থাকে অনেকান্তিক তাৎপর্য। পীতেম থেকে শারিবা, নাকি বলব রহু থেকে শারিবা পর্যন্ত যে বহু প্রজন্ম ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতার বয়ান এ আখ্যান তা মূলত 'গতি ও স্থবিরতার দ্বিবাচনিকতার আখ্যান। কত ব্যক্তি-অস্তিত্ব তাদের স্বপ্ন, বেদনা, প্রেম, ঘৃণা নিয়ে হারিয়ে যায় দীর্ঘ সময় প্রবাহে। যাযাবরদের পথ চলা এক সময় ফুরিয়ে আসে, তারা প্রবেশ করে গার্হস্থ্য জীবনে— বারবার উৎ খাত হয়েও শেষ পর্যন্ত বহু মূল্যের বিনিময়ে লাভ করে স্থিতি। গোষ্ঠীবিশ্বাস ও প্রকল্পনার রঙ দিয়ে যে মুখচ্ছবি তারা তৈরি করে, বাস্তবে তা রূপ পায় না। 'পুবের দেশ'-এর সুখ স্বাচ্ছন্দ স্বর্গের অঢেল সুখের মতোই অধরা রয়ে যায়। একের পর এক মৃত্যু, ব্যক্তির পরাজয়, বিষন্নতা—তবুও তারা পথ চলে—পথে পথে অর্জন করে অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায় তারা শিখে নেয় সব মাঠচরা জন্তু তাদের হলেও সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো দারোগার। যাযাবর নারীরা যে কোনো অজুহাতে ধর্ষিত ও লুণ্ঠিত হওয়ার জন্যেই থাকে। তবু তারা বিভ্রান্ত হয় না। সমস্ত নেতি, ভয়, ভুল, মৃত্যু, গ্লানি, সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে অশিক্ষিত এই মানুষগুলো তাদের অভিজ্ঞতার এই বৃশ্চিক গ্রথিত আঁধারের পরও স্বপ্ন দেখে। কবিতায় যে স্বপ্ন ব্যক্ত হয় এভাবে—

> 'তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন
>
> জেগেছে শালিধান
>
> ইতিহাস—ধুলো—বিষ উৎসারিত করে নব নবতর

মানুষের প্রাণ

প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি

চেতনার আভা নিয়ে তবু

খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ

নির্দেশী ।' *(অন্ধকার থেকে/বেলা অবেলা কালবেলা)*

তারা জানে 'যা পরিত্যাজ্য তাই পিছনে ফেলে যেতে হয়। তার কথা মনে রাখার কোনো কারণ নেই।'(পৃ.৬) তাই সমাপ্তিহীন মুক্ত উপসংহারে এসে দেখি জীবনের চিরচলিষ্ণুমানতাকে স্বীকার করে নিয়ে অতীতের স্মৃতি ও বিষাদ পেছনে ফেলে শারিবা ও মালতী নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যায়—

> 'শারিবা উঠে দাঁড়িয়ে মালতীকে হাত ধরে তোলে, তারপর দু-জনে গ্রামের দিকে ফিরতে থাকে।' [১৭]

সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক আবার তারই সঙ্গে প্রান্তিকায়িতের জীবন বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসটি। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'মানবিক এই আলেখ্য থেকে শুধু যে সভ্যতার ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়; গোষ্ঠী অস্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক এবং সময় ও পরিসরের যুগলবন্দিও প্রকট হয়ে পড়েছে। একদিকে দ্রুত বহমান নিষ্ঠুর সময় প্রবাহ এবং অন্যদিকে যাযাবর বাজিকরদের জীবন জীবিকার পরিবর্তন যে অমোঘ বাস্তবতাকে মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, তাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে প্রত্নস্মৃতি ও কিংবদন্তির অধিকার বাস্তবতা আবশ্যিক বলে বিবেচিত হচ্ছে। যাযাবরেরা পথে পথে ভেসে বেড়াতে চায়, কিন্তু সময়ের দাবিতে তাদের উত্তীর্ণ হতে হয় গার্হস্থ্যে। একদিকে পরিবর্তন সম্পর্কে বিপুল অনীহা এবং অন্যদিকে নতুনের জন্যে আগ্রহ এই উপন্যাসের মর্মগত দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকে অনুভবগম্য করে তুলেছে।...... অভিজিৎ প্রান্তিকায়িত ওই গোষ্ঠীর মধ্যে খনি থেকে তোলা আকাটা হীরের মতো, জীবনের খাঁটি আবেগ প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা যে বর্ণ ও বর্গগত বিচারে সমাজের পক্ষে সর্বহারা ব্রাত্যজন, এই এমোঘ অবস্থান উপন্যাসে প্রতিফলিত দর্শন ও নন্দন চেতনাকে আমূল পুনর্বিন্যস্ত করে নিয়েছে।'[১৮]

চার

যে দেশগুলি কোনো না কোনো সময়ে ভিন্ন কোনো দেশের উপনিবেশ ছিল, সে দেশগুলি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার দুর্মর মোহে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। নিজের সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ঔপনিবেশিক প্রভুদের সংস্কৃতির ছদ্ম আভিজাত্য (false superiority)-এর গুণকীর্তন করে তারই অনুকরণের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করে। আমরা জানি যে, শাসকেরা কেবল মাত্র বল প্রয়োগের দ্বারা শাসন কার্য সম্পন্ন করে না, তারা শাসিতদের নিয়ন্ত্রণ করে মতাদর্শের দ্বারা। নিজেদের উচ্চারণকে তারা সম্পূর্ণ সমাজের উচ্চারণ বলে উপস্থাপিত করে এবং বৃহত্তর জনসাধারণকেও ওই সংকীর্ণ দৃষ্টির শরিক করে তোলে। প্রত্যেক শাসক গোষ্ঠীই কমবেশি এরকমটা করে থাকে। উপনিবেশের প্রভুর ক্ষেত্রে সেখানে যোগ হয় নিজেদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বোধ। ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার আধিপত্য বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করে জ্ঞানকে। উপনিবেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যকে সবকিছুকে নিজেদের মতো করে বদলে এক ছদ্ম বাস্তবতার নির্মাণ করে নিজেদের শাসন কায়েম রাখার বন্দোবস্ত করে উপনিবেশিক রাষ্ট্র। এই সাংস্কৃতিক উপনিবেশের জের চলতে থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও। আর বিশেষত আজকের বিশ্বায়নের যুগে যখন নয়া সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ বিশ্বে নতুন করে জাঁকিয়ে বসছে তখন আবার তৈরি হতে দেখি এক মোহিনী ফাঁদ। সেই ফাঁদে ধরা পড়লে দাঁড়ে বসে পর্যাপ্ত বিনোদনী অনুষ্ঠান খেয়ে ‘বিশ্বায়নের জয়’ এই শেখানো বুলিই বলে যেতে হয়। অন্ধ প্রতিযোগিতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতিহীনতা ‘দিল মাঙ্গে মোর’-এর উৎকট উন্মত্ত আস্ফালনকেই আদর্শ হিসেবে তৈরি করে দিতে চ্যানেলে চ্যানেলে আয়োজন। তবে রাতের পর দিন আসেই। রাতের সবচেয়ে অন্ধকার মুহূর্তের পর আসে সূর্যের প্রথম কিরণের আভাস। কঠিন পাথরের বুকে জন্ম নিয়েও বেড়ে উঠতে পারে বটগাছ।

তাই দেখি, বাস্তব যখন হাজারো মিথ্যার শৈবালাচ্ছন্ন গতিহীন শীর্ণকায়া নদীর চেহারা ধারণ করে তখন কল্পনার অন্তঃসার থেকে জেগে ওঠা প্রকল্পনা হড়পা বানের মতো বাস্তবতার আবিলতাকে সরিয়ে দিয়ে পরা বাস্তবকে নির্মাণ করে। সমালোচকের ভাষায়—

> এই পরা-অস্তিত্ব নির্দ্বিধায় সরিয়ে দেয় বাস্তবকে; অপর জগৎ অধিকার করে নেয় অভ্যস্ত প্রেক্ষিতকে। তথ্যের পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে সত্য যেন আকাশবিহার করতে শেখে। সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রম নিমেষে বদলে যায় ; যে কোনো মুহূর্তে যে-কোনো পরিস্থিতি গড়ে ওঠে এবং ভেঙে যায়। চিন্তা ও অনুভূতির আকরণে কিছুমাত্র রুদ্ধতা থাকে না আর। এই অসম্ভব সম্ভাবনাকে কেউ কেউ

> বলেন ইন্দ্রজাল, কেউ বা বলেন উদ্ভটের কল্পকথা, আর কেউ একে অলৌকিক মায়া বলে থাকেন। আধুনিকোত্তরবাদী কথাকারদের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব টমাস পিন্‌কোঁ, 'The Crying of Lot 49 (১৯৬৬)-এর প্রতিবেদন এ সম্পর্কে লিখেছেন 'You know what a miracle is... another worlds intrusion into this one. Most of the time we coexist peacefully, but when all do touch theres cataclysm' এটা কেবল কল্পনা প্রবণ কথাকারের ভাববিহ্বল উক্তি নয়, গভীর অনুভূতির সত্য।' [১৯]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে আরো একজন তাত্ত্বিকের উক্তি—

> 'The imagintion is what providence uses in order to get men into reality, into existence, to get them far enough out, or in, or down in existenec. And when imagination has helped them as far out as they are meant to go–that is where reality, properly speaking, begins.''(কীর্কেগার্দ) [২০]

বাংলা সাহিত্যে ঔপনিবেশিক কালে ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত কথাসাহিত্যে আমরা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা বা যাদু বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছি। যে বাস্তব পীড়াময় তাকে বাতিল করে প্রতিবাদী মন তৈরি করে নেয় নিজস্ব বাস্তব—যা আসলে প্রকল্পনা কুহক ও ইন্দ্রজালের অন্তবর্য়ন। এভাবে আসলে প্রত্যাঘাত করা হয় তথাকথিত অভিজাত চিন্তা প্রকরণে। অনাবিষ্কৃত অনালোকিত পরিসর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নয়া সাম্রাজ্যবাদের কালো চশমায় সবই যখন আবছায়া। —তখনও এই অন্ধ সময়ে বসেও অনেক সাহিত্যিক আলোর তপস্যায় রত। এই সূত্রে যাদু বাস্তবতায় প্রয়োগ তাই হয়ে পড়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

অভিজিৎ সেন ল্যাতিন আমেরিকার বিখ্যাত লেখক গ্যাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজকে নিজের বর্তমানের প্রিয় বিদেশী সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেন। মার্কেজের লেখায় ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বিষয়। যিনি নিজে তাঁর নোবেল পুরস্কার গ্রহণের ভাষণে জানিয়েছিলেন, তাঁর আকাঙ্খিত হল

> 'এমন বাস্তবতা যেটা শুধুমাত্র কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেটা সবসময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁচে, প্রতিমুহূর্তে নির্ধারণ করে অগুনতি দৈনন্দিন মৃত্যু, যেটা খাদ্য যোগায় এক চির অতৃপ্ত সৃষ্টির প্রবাহকে। ...আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ এটাই যে আমাদের জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার

জন্যে প্রচলিত কৃৎকৌশল মোটেই কুলোয় না।...অন্য লোকের নকশা বা সংহিতা দিয়ে আমাদের বাস্তবতার আন্তর আখ্যান দেবার চেষ্টা প্রতিবারই কেবল আমাদের ব্যবধান ও অপরিচয় বাড়িয়ে যায়, প্রতিবারই আরো বেশি রুদ্ধ হয়ে ওঠে তা, প্রতিবারই আরো বেশি নিঃসঙ্গ।...আমরা যারা কথা বানাই, কাহন গড়ি আমরা তবু কিন্তু বিশ্বাস করি সব কিছু, বিশ্বাস করবার দাবি ও অনুভূতি রাখি যে এখনও এক বিকল্প/ বিরুদ্ধ কল্পরাজ্য গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করার সময় আছে—এখনও সময় চলে যায়নি। এক নতুন ও সর্ব-সমান-করা কল্পরাজ্য—জীবনেরই কল্পরাজ্য—যেখানে, সত্যিই ভালোবাসা হয়ে উঠবে নিশ্চয় আর সুখ হয়ে উঠবে সম্ভব।'[২১]

মার্কেজের One Hundred Years of Solitude'এর আভাস অভিজিতের 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। মার্কেজের উপন্যাসটিতে বাস্তব আর পরা বাস্তবের অন্তর্বয়নে বর্ণিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের বিবর্তন আর লয় প্রাপ্তির শতবর্ষব্যাপী কাহিনি। আর অভিজিতের উপন্যাসেও বর্ণিত হয়েছে একটি পরিবারের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বিস্তৃত জীবনাখ্যান। বৃদ্ধ পীতেমের মধ্যে ফুটে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ছায়া আর সালমার মধ্যে উরসুলা ইগুয়ারান-এর আভাস। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দুই বৃদ্ধকেই দেখি গাছের আশ্রয় গ্রহণ করতে। স্থবির দুই বৃদ্ধের মহাস্থবির বৃক্ষকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা যেন হয়ে ওঠে প্রতীকী। জনৈক সমালোচক এই দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'পীতেম বাজিকর গোষ্ঠীর দলপতি— সে দিক নির্দেশ খোঁজে, যেভাবে মার্কেজের মোকান্দোর কুড়ি ঘর নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেছিল। ইন্দো-ইরাণীয় যাযাবর জনগোষ্ঠী এভাবেই মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলো। মোজেস তার জনগোষ্ঠীকে নতুন ভূখণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন, ম্যাজিকাল রিয়ালিটির তরঙ্গ পেরিয়ে। পীতেম এমনই এক প্রত্যয়ে বাসযোগ্য ভূমি, আবাদযোগ্য জমি খোঁজার চেষ্টা করে। পূর্বপুরুষ রহুর সাবধান বাণী সত্ত্বেও, তার উত্তরপুরুষ সমগ্র উপন্যাসে আশ্রয় খোঁজে। স্বস্তি চায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিতে, সমাজের মূল স্রোতের প্রতিবেশি হয়ে।'[২২]

মার্কেজের উপন্যাসে যাযাবর মেলকিয়াদেস তার অতিলৌকিক কার্যকলাপসহ জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও অন্যান্য কুশীলবদের প্রভাবিত করে। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ রহু দেখে কবে বাজিকরদের পথ চলা শেষ হবে। তার হাড়কে নিয়ে বাজিকররা বেঁচে থাকার রাস্তা খুঁজে। বাজিকরদের জীবন প্রভাবিত হয়

তার অশরীরী ছায়ার দ্বারা। মার্কেজ যেমন দুঃস্বপ্নের মতো আতঙ্কজনক বাস্তবকে প্রকাশের জন্যে জাদু বাস্তবের কৃৎকৌশল গ্রহণ করেন, তেমনি অভিজিৎ ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত দেশের বাস্তবতাকে প্রকাশ করেন ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার সাহায্যে। আসলে মার্কেজের সঙ্গে অভিজিতের সাদৃশ্য এখানেই। যে অর্থে জীবনানন্দ পাশ্চাত্যের পরাবাস্তববাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ঠিক সেই অর্থে অভিজিৎ যেন ঋণী মার্কেজের কাছে। গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর উপন্যাসে লাতিন আমেরিকার রক্তাক্ত বাস্তবকে বাস্তবতর করে পুনর্নির্মাণ করেছেন। অভিজিৎ বিদেশাগত এই কৃৎকৌশলকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব শিকড় সম্বন্ধে সচেতন থেকে। লাতিন আমেরিকার ইতিহাস থেকে মার্কেজের উপন্যাস বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যেখানে ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় অভিযানকারীরা আদি জনগোষ্ঠীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু আবার ইউরোপীয় বংশোদ্ভুতদের নিয়ে গঠিত দেশগুলিকেও স্বাধীনতা লাভ করতে হয়েছে রক্ত দিয়ে। তারপরেও সাম্রাজ্যবাদ উলঙ্গ পৈশাচিকতায় লাতিন আমেরিকার জনপদগুলিকে বিধ্বস্ত করছে ঠিক ততটাই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যেভাবে একসময় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল মায়া, আজটেকদের। তাই মনে হয় '....সময় আসলে এগোচ্ছে না, বরং একটা বৃত্তের ভেতর ঘুরছে'।[২৩] (One hundred years of solitude) মার্কেজ তার উপন্যাসে কয়েক প্রজন্ম ব্যাপী নিষ্ঠুরতার কাহিনি বলে চলেন নির্বিকার মুখে আজগুবি, উদ্ভট ঘটনার সংমিশ্রণে। ফলে এখানে লৌকিক ও অলৌকিক বাস্তব ও অবাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে, সময়ের গতি কখনো মন্থর কখনো দ্রুত।

কথাসাহিত্যিক তথা প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুল হক মার্কেজের উপন্যাসটির সম্বন্ধে 'মহাদেশের কথকঞ্জ গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> 'যা ঘটে তা বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য, ঘটনার কর্কশ বাস্তব বর্ণনা এবং মুহূর্তেই তাকে অবাস্তব বানিয়ে তোলা—একই সঙ্গে পর্বতশিলার মতো কঠিন আর পারদের মতো তরল 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' হয়তো মার্কেজের দিদিমার মুখের গল্পের মতোই। .....অথচ তিন প্রজন্মের এই কাহিনী কী নিষ্ঠুর বাস্তব, মার্কেজের নিজের দেশের ইতিহাসের বীভৎস বাস্তবের কী ভয়ানক ছবি!'[২৪]

অভিজিৎ সেন এই একই নির্লিপ্তির সঙ্গে আমাদের দেখান সনাতন হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে চলতে থাকা জাতপাতের কঠোর নিষ্ফল বাছবিচার। সমতার বাণী নিয়ে আসা ইসলাম ধর্মেও অনুপ্রবেশ করা জাত বেজাতের প্রশ্ন। আর এসব বাছবিচারে বিড়ম্বিত হতে থাকা বিভিন্ন অন্তেবাসী জনগোষ্ঠী। তাদের এই বিড়ম্বিত, নিরন্তর সংঘাতময় জীবনযাপনের কঠোর বাস্তবতা পাঠকের অভ্যস্ত ছকে বাঁধা বাস্তবের বাইরে। কারণ শিষ্ট সাহিত্যের এই ছকে বাঁধা বাস্তবে ছদ্ম আভিজাত্যের বোধ পুঞ্জীভূত মিথ্যা, ভণ্ডামি,

আত্মরতি আর ইচ্ছাপূরণের কল্পনারই ভিড়। অভিজিৎ যখন অন্তেবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্য উপস্থিত করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পায় প্রত্নকথা, আদিকল্প ও কিংবদন্তী, যেগুলো জড়িয়ে আছে লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে। ফলে ঘনীভূত হয় প্রকল্পনার জগৎ অথচ তা চূড়ান্ত বাস্তবও বটে। লেখক তো কেবল মাত্র লোকজ উপাদান থেকে উপকরণ আহরণ করেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকের মতো অথবা বলা যেতে পারে সত্যসন্ধানী গোয়েন্দার মতোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাস থেকে। ফলে বাস্তবতা ও অধিবাস্তবতা মিশে যায় অক্লেশে, একে অপরকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে ওঠে। আসলে অভিজিৎ সেন জানেন এবং মানেন 'প্রত্যক্ষ ভূতের চেয়ে লোককথার ভূতের প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ বাস্তব'। তাই তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির এই অনুপুঙ্খ গ্রহণ করে তৈরি করে নেন বিকল্প বাস্তবতা এবং 'কথাবস্তু গ্রন্থনার বিকল্প সম্ভাবনা'। এভাবে আমরা দেখি, অভিজিতের সাহিত্যে লোকায়ত জীবন, লোককথা, কিংবদন্তী, পুরাণ প্রভৃতির ব্যবহার পদ্ধতির উপর লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে তুলেছেন লেখক আপন প্রতিভাবলে। লেখক নিজে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

> 'রূপকথার গল্প নয়, লোককথাও নয়, কিন্তু লোককথার বাস্তবতার (যদি এমন কিছু বলা যায়) শক্তিশালী মাধ্যম দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যে এক নয়া আধুনিকতা এনেছে ; সেই আধুনিকতায় যুক্ত হয়ে আছে অপরিচিত এক রহস্যের সৌন্দর্য। ইউরোপীয় বুদ্ধি এবং মনস্তত্ব চর্চার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের ক্লান্তিকর কসরতের অনুসরণের বদলে আমাদের সাহিত্যিক মুক্তি বোধহয় ওই পথেই সম্ভব হতে পারে।... আসলে গল্প বা উপন্যাসের একটা বিশেষ আঙ্গিক তৈরি করে। আমাদের লৌকিক অস্তিত্ব বা লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাব যখন আড়াই শ বছরের ইউরোপীয় শিক্ষাতেও নির্মূল হয়নি, তখন বুঝতে হবে অনেক বেশি শক্তিশালী সেই শেকড় মাটির অনেক গভীরে।'
>
> *(মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা)*

অর্থাৎ পথ হতে পারে দক্ষিণ আমেরিকা সাহিত্যকারদের প্রদর্শিত পথ কিন্তু পাথেয় সম্পূর্ণ নিজস্ব দেশীয় 'লৌকিক অস্তিত্ব বা লোকয়ত সংস্কৃতি'। এসময়ের বিশিষ্ট সমালোচক তথা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য উপন্যাসটির সম্বন্ধে লিখেছেন—

> 'রহু চণ্ডালের হাড়ে'র অণুবিশ্ব লাতিন আমেরিকার সেই ঐন্দ্রজালিক

বাস্তবতাবোধকে মনে করিয়ে দেয় যা ঔপনিবেশিক আধুনিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাস্তবতাবোধের প্রতিস্পর্ধী ও বিকল্প ভাবকাঠামোর প্রস্তাবক। অভিজিৎ সেন উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায়-আকরণিক বিন্যাসে, প্রায়োগিক চেতনায় ছদ্ম বাস্তবতার অপূর্ণতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। তিনি এমন এক পূর্ণাঙ্গ নব্য-বাস্তবতার সন্ধান করেছেন যা অনায়াসে কল্পচেতনাকেও আত্মস্থ করতে পারে। আপাত-অলৌকিক উপাদানের মধ্যে কোনো জনগোষ্ঠীর বহুযুগ সঞ্চিত প্রত্নস্মৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে বলে গোষ্ঠী-জীবনের বিভিন্ন অনুপুঙ্খকে তিনি কথা বয়নে টানা ও পোড়েন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বারবার ধূসরায়িত অতীত ছায়া ফেলে যায় বর্তমানে, চকিতে পরস্পর স্থান বদলও করে নেয়। বাজিকর শারিবাকে দিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাসের গ্রন্থনা; আবার শারিবার-ই জীবন-সন্ধান ও ইতিবাচক প্রত্যয় এর সমাপ্তি। তবু মনে হয়, শতক অনুযায়ী স্মৃতি রোমন্থনের বিপুল পটে এই সূচনা ও সমাপ্তি প্রতীয়মান দুটি বিন্দু মাত্র। কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে আপাত সময় যে গ্রন্থিল নক্সা তৈরি করেছে— তাতে প্রবহমানতাই আসল। গোর্ড গেনেট যেমন বলেন, উপন্যাস কেবল সময়-স্বভাবের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তাতে ফিরে যাওয়া নয়; আখ্যানের টানা ও পোড়েন সময় যেন অনবরত 'ruled, captured, bewitched, surreptitiously Subverted '(১৯৮৭ঃ১২৩) হয়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব আকল্প অনুযায়ী সময়স্রোতকে কখনো সরল ভাবে বয়ে যেতে দেন, কখনো বা তাকে করে তোলেন দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। তিনি কীভাবে দেখছেন, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিকের দেখা ও দেখানোর ধরন যেহেতু দ্বিবাচনিকতার আদর্শকে পুষ্ট করে, উপন্যাসের কথন-বিশ্বে একবাচনিক কণ্ঠস্বরের কোনো স্থান নেই। উপন্যাসের মৌল দ্বিবাচনিক স্বভাব প্রমাণিত হয়, 'an eternal re-thinking and re-evaluating'(বাখতিনঃ১৯৮৪ঃ৩০) প্রক্রিয়া দিয়ে। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-ও এই দ্বিবাচনিক জগৎকে সময় ও পরিসরের সমান্তরালতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।'[২৫]

পাঁচ

সাম্প্রতিক যথার্থ ঔপন্যাসিকরা সময় ও সমাজের, জীবন ও দর্শনের স্থপতি। সেইসঙ্গে তাঁরা সময়ের বিনির্মাতা ও পুননির্মাতাও বটে। কারণ কেবল যা ঘটছে চোখের সামনে তাকেই উপন্যাসে রূপায়িত না করে তাঁরা কল্পনার সাহায্যে লক্ষ্য করেন যা ঘটতে পারে, আবার কখনো ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই কল্পনার রঙে বদলে দেন 'অপরিচিতীকরণের উদ্দেশ্যে। তাঁরা খণ্ডকালকে বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব হিসেবে দেখেন না কারণ মহাকালের মধ্যে বুদবুদের মতো ক্ষীণ অস্তিত্বের খণ্ডকাল কোনো মহৎ প্রতীতির জন্ম দিতে পারে না। তাই তাঁরা আখ্যানে রূপায়িত করতে চান মহাসময়ের গ্রন্থনা, বহমান সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অভিজিৎ সেন তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বর্ণনা করেন কয়েক প্রজন্মে শতবর্ষব্যাপী পথ চলার বৃত্তান্ত। দনু, পীতেম, লুবিনি হয়ে শারিবার পর্যন্ত যে পথ হাঁটা আজও শেষ হয়নি। আর তারও আগে আছে রহুর প্রত্নকথা। অসংখ্য চরিত্রের মিছিল তাই পুরো আখ্যানে। আবার সময়ের বহতা রূপের পাশাপাশি ব্যক্তির একক দর্পণে প্রতিফলিত অভিজ্ঞতা, সময় স্বভাবও স্থান পেয়েছে। ফলে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার খণ্ড চিত্র যেমন আখ্যানে রূপ পায়, তেমনি সে ঘটনায় আবর্তিত ব্যক্তি-জীবন আসে ততোধিক গুরুত্ব নিয়ে। আবার লক্ষ্যনীয় ইতিহাস হিসেবে পাঠ্যপুস্তক আমাদের যে শাসক অনুমোদিত খণ্ড খণ্ড সময়ের ছবি দেয়, আখ্যানে তা বর্ণিত হয়নি। এখানে আমরা পাই 'হয়তো যা ঘটেছিল' তাঁর আভাস। উদাহরণ হিসেবে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাযাবর বাজিকরদের জীবন আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়েছে সাঁওতালদের সঙ্গে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে। পরতাপ আর জিল্লু মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সাঁওতালদের গ্রামে আশ্রয় পায়। সেখানে তারা লাভ করে অনাস্বাদিত কিছু অনুভব। তারা বাঘ শিকার করে, ধান চাষ করে, ফসল ফলায় আর প্রথমবারের মতো লাভ করে গৃহস্থের বন্ধুত্ব, সম্মান। কিন্তু ঘটনাচক্রে অতিথি বাজিকরদের দ্বারা লক্ষণ সোরেনদের সেই গ্রামে ঘনিয়ে ওঠে মহাজন ও সাঁওতালদের সংঘর্ষ। একটি নির্দিষ্ট গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে না সে বিদ্রোহ—দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত শোষকদের বিরুদ্ধে— যাদের মধ্যে আছে জোতদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার,— ঘাটোয়াল, জমিদার, সাহেব, পুলিশ, দারোগা, ব্রাহ্মণ, আড়তদার, গোলাদার, মহাজন। আসলে বিদ্রোহের বারুদ জমা হচ্ছিল দীর্ঘদিনের অত্যাচার শোষণের ফল হিসেবে একটু একটু করে। সেই সময় বাজিকরদের দ্বারা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির কাজটুকু ঘটে। শোষিত শ্রেণীর যুদ্ধ হুংকারে যে শাসক ও শোষক শ্রেণী নির্বিকার বসে থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। সুশিক্ষিত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে শাসক শ্রেণী বিদ্রোহ দমনের নামে শুরু করে গণহত্যা। আবার অত্যাচারকে অবিবেচিত অত্যাচার দিয়েই প্রতিহত করতে চাইলে বিদ্রোহ যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা

সত্তরের দশকের লেখকদের কাছে প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। লক্ষণ সোরেনের হত্যা এবং সাঁওতালদের গ্রামগুলিতে চালানো গণহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পিয়ারসন নামক সুশাসক ম্যাজিস্ট্রেট ও আরো চার ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করা হয়, তখন লক্ষণের স্ত্রী পীথা উচ্চস্বরে অভিশাপ দিতে থাকে নিজের ছেলে ডুমকা ও তার সহকারীদের। সেই বধ্যভূমিতেই ইংরেজ বাহিনির কামানের গোলায় ডুমকা ও আরো পঞ্চাশ ষাট জনের মৃত্যু হয়। নিজেদের অসাবধানতায় ঘটা এই ক্ষয়ক্ষতিকে বহেরার মানুষেরা পীথা ও আরো তিন স্ত্রীলোকের অভিশাপের ফল ভেবে নিয়ে, তাদের ডাকিনী চিহ্নিত করে হত্যা করে। আর এসব ঘটনা দেখে পরতাপ, জিল্লু, বালি, পিয়ারবক্স চার বাজিকর, যারা ইংরেজ বাহিনি থেকে পালিয়ে স্বেচ্ছায় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তারা পালিয়ে যায় আবার। অন্যদিকে সাঁওতালদের সব গুরুত্বপূর্ণ অধিনায়করা আহত হলে তাদের আর যুদ্ধ জয়ের আশাও থাকে না। তবে তার স্মৃতি রয়ে যায় মানুষের মনে যা ইন্ধন যোগাবে পরবর্তী বিদ্রোহের সময়। লেখক আমাদের একথা বোঝান পুরোনো একটি বিদ্রোহের উল্লেখ করে এভাবে—

> '... একদিন শোনা গেল কোথায় নাকি সাঁওতালরা সভা করেছে, তার পরে এক দারোগাকে সদলবলে খুন করে বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়েছে। রাজমহলে তখন সরকারি মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য শুরু হয়। থানা পুলিশ বন্দুক লাঠি সব জোরদার করা হতে লাগল। কেননা মানুষের স্মৃতিতে বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহের কথা তখনো জাগ্রত ছিল।'[২৬]

আমরা বুঝে নিই, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এবং সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রান্তিকায়িতের লড়াই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং তা ছিল, আছে, থাকবে। আর একটি বিদ্রোহের স্মৃতি উৎসাহ ইন্ধন যোগাবে পরবর্তী বিদ্রোহে। তাই তো এই অংশের পরেই লেখক আমাদের জানান গাধার চাট খেয়ে দয়ারামের মৃত্যু হলে সুফল পালায় মৃত মনিবের ঘোড়া নিয়ে। তার ভাবনা হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয় সিধু কানুর নামও। পরবর্তী আর তার এক অধ্যয় পরেই দেখি যে পাঁচ বাজিকর যুবককে জোর করে ইংরেজ বাহিনির হয়ে যুদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা চারজন সেপাইকে হত্যা করে যোগ দেয় সাঁওতালদের সঙ্গে। এভাবে আখ্যানকার পাঠকৃতিতে সঞ্চারিত করেন রাজনৈতিক সময়ের আকল্প, যে সময়ে সাধারণ অভিজ্ঞান বদলে যায়, যখন রক্তে জেগে ওঠে উজ্জীবনের গান। চিরলাঞ্ছিত মানুষেরাও অনুভব করে অসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুও ভালো।

সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ লেখক উপন্যাস নিয়ে আসার আগে পাঠকদের কাছে ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঙ্গে চলতে থাকা অবিচার, শোষণের ইতিহাস। ব্যক্তি এবং

গোষ্ঠীর দু'য়েরই দুরবস্থার কথা লেখক জানান মুন্সীয়ানার সঙ্গে। সুফল মুর্মু যে দশ বছর ধরে দয়ারাম ভকত নামক এক মহাজনের কাছে আছে, জন্তুর থেকে বেশি অপমান সহ্য করে তার কথা। কোনো এক সময় তার বাবা পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিলেন দয়ারামের কাছ থেকে আর এ যে কেবল কোনো এক ব্যক্তির কাহিনি নয়, তার প্রমাণ, শহরায় পূজায় করা গানগুলো , পীতেম ও লক্ষণ সোরেনের কথাপোকথন । মহাজনরা ঠকাচ্ছে জেনে এবং বুঝেও তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে একক প্রতিবাদের ফল অত্যাচার পুলিশি ঝামেলা, জেল। আর সমবেত প্রতিবাদের জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘনিয়ে ওঠে কারণ 'কতদিন মানুষ সহ্য করে?'

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট, ফলাফল আসে এ আখ্যানে বাজিকরদের বাসস্থান তাদের চলাফেরা করা অঞ্চলের বিবরণের সূত্রে। আর এই সংযোগ না থাকার কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা আখ্যানটিতে আসে না। আসে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা, আসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা নানা উপভাগের কথা। অর্থাৎ স্বল্প পরিসরে ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের জাতপাতের ভাগাভাগি সংর্ঘষের সামাজিক চিত্রটি। অন্যদিকে বাজিকরদের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। রহু তাদের দেবতা নয়। কারণ যে স্থিতিশীল সমাজে দেবতা জন্ম নেয়, সেই সমাজ তাদের তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। তাই স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় প্রশ্ন ওঠে ''তুমরা হিঁদু না মুসলমান '', প্রশ্ন ওঠে—

'হাঁ বাপু, তোমরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেমকা জাত বাপো!'[২৭]

আর এ প্রশ্নের জবাব যেহেতু প্রশ্নকর্তাদের পছন্দ হয় না, তাই বাজিকররা সমাজে স্থান পায় না। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না হিন্দু বা মুসলমানরা । বাজিকররা ভাবে নমোশূদ্র বা মালোঝালো প্রভৃতিরা যেহেতু হিন্দু বর্ণাশ্রমের একবারে নীচুতলার বাসিন্দা, ব্রাহ্মণসমাজে অস্পৃশ্য বেজাত তবে হয়তো এখানে তাদের স্থান হবে। তারা 'মূর্খের মতো আবেদন করে, হামারদের আপনার জাতে তুল্যে লেন, মালিক'। তারা জানতনা হিন্দু হয়ে জন্মান যায়, হওয়া যায় না। ফলে ঝালোদের মেয়ে পাখি আর বাজিকর যুবক সোজন বা নমোশূদ্রদের মেয়ে মালতী আর বাজিকর ওমরের সম্পর্কের বিষাদান্তক পরিণতি ঘটে। বহুধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের কোনো অংশেই তারা স্থান পায়না। যদিও এরই মধ্যে রূপার মতো দু একজন নিজেদের হিন্দু ভাবতে শুরু করেছে। হিন্দু ধর্মে প্রবেশের কোনো রাস্তা না থাকলেও ইসলাম ধর্মে সবার জন্যে অবারিত দ্বার। তাই বাজিকরদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধা থাকে না। কয়েকঘর বাজিকর বাদ দিয়ে সকলে ছেষট্টি সালের মহরমে সদলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ঘটনাটি ঘটে কিসমতের হাজি খেসের সাহেবের তত্ত্বাবধানে। তবে এখানে লক্ষণীয়, হাজি সাহেব এ কাজ বিধর্মীকে মুসলমান করার পুণ্য লাভের বিশেষ ইচ্ছায় করেননি, তাঁর নজর ছিল সধর্মী বাড়ানোর দিকে। লেখক

জানাচ্ছেন—

> 'দেশভাগের পর সমষ্টিগতভাবে মুসলমান এদেশে দুর্বল হয়ে গেছে। উপরন্তু ওপার থেকে যেসব হিন্দুরা এসেছে তাদের আক্রোশ ও জ্বালা নিভবার কোনো লক্ষণ নেই। উসকানি দেবার লোকের অভাব কোনদিন কোথাও হয় না। হাজি খেসের সমাজপ্রধান হিসাবে সদাই শঙ্কিত থাকে। শারিবাকে সে বোঝায়, ইসলামে জাতপাতের বালাই নেই। কাজেই বাজিকর মুসলমান হলে ধর্ম পাবে, সমাজ পাবে, স্বজন পাবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কিবা অর্থ হয়।..... একজন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে হজ্জের সমান পুণ্য। কিন্তু হাজি খেসের-এর নজর সেদিকে নয়। স্বজন কমে গেছে বাড়বে না, কিন্তু সধর্মী বাড়বে।'[২৮]

রাজনৈতিক সময় যে এখানে ছায়া ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক বাজিকররা স্থিতি, ধর্ম, সমাজের আশায় ইসলাম গ্রহণ করল বটে, কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হল না। তারা যেমন অচ্ছুৎ ছিল তেমনি অচ্ছুৎই রয়ে গেল। কোনো মুসলমান ঘরে তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না। তারা রয়ে যায় একই রকম নিরন্ন, হাঘরে সমাজ বহির্ভূত, 'পাখমারা আর বাদিয়া মোছলমানের মতোই বেজাত মোছলমান'। *(পৃ.২৩৫)*

বাজিকরদের সঙ্গে এই যেন এক সমাপ্তিহীন ট্র্যাজেডি। তাদের চলার পথের প্রত্যেকটি জায়গাতেই তারা বেজাত হিসেবেই পরিচিত। গল্পচ্ছলে শারিবাকে সে কথাই বলত তার নানি লুবিনি—

> 'হামরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা। গোরখপুরে হামরা অছুৎ ছিলাম। তার আগে যেথায় ছিলাম, সেথা তো হামারদের ছেঁয়া মাড়ানো পাপ!'[২৯]

একমাত্র রাজমহলে সাঁওতালদের কাছে তারা লাভ করেছিল প্রথমবারের মতো সাদর সম্ভাষণ, বন্ধুত্বের আস্বাদ। প্রকৃতির বিশাল উদারতায় বেড়ে ওঠা এই মানুষগুলোও সভ্য সমাজে অসভ্য বলে পরিচিত। তারাই চারিয়ে দিয়েছিল বাজিকরদের মধ্যে স্থায়ীত্বের প্রতি আকর্ষণ, নিজের হাতে বোনা ফসলের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার মধ্যে উপলব্ধি করা উত্তেজনা, আনন্দ। এছাড়া আর কোথাও তাদের প্রতি কোনো সমাজ সামান্যতম সহানুভূতি বা সম্মান জানায়নি। ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে হানিফ পলবি আর শারিবার সূত্রে বাজিকরদের আপন করে নিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মুসলমান সমাজ তা করেনি।

বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের দাঙ্গার রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা এসে পড়ে। রূপা ইয়াসিনকে বলে—

> 'হামরাদের জাত হবে! কি হবে তা মাও বিষহরিই জানে। হামি হিঁদু হলাম, তুমু

মোছলমান হলেন। হিঁদু আমাক জাতে লেয় না, মোছলমান জাতে লিবে, সি বিশ্বাস আমার নাই। ....তবু রূপায় যখন নাই, যান তুমরা, হন মোছলমান।... কেবা জানে, হয়ত একদিন তুমার বেটা হামার মাথাৎ ডঙ্গ মারবে 'শালো হিঁদু বলে, আর হামার বেটা তুমার বুকেৎ ফাল্লা বিঁধাবে 'শালো মুছলমান' বলে।' ৩০

ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে একত্রে থাকা দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশদের বপন করা যে বিষবৃক্ষ এখনো ফলবান তারই স্মৃতি যেন জেগে ওঠে এই মন্তব্যে। আবার এই উক্তির মাধ্যমে আমাদের কি মনে পড়ে যায় না পূর্বভারতের মুসলমানদের একটি বৃহৎ সংখ্যাই হল ধর্মান্তরিত মুসলমান। যারা কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো অনিচ্ছার গ্রহণ করেছিল ইসলাম ধর্ম। যারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল ইসলাম ধর্ম তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিভিন্ন কারণের প্রধান কারণগুলো ইসলামের বর্ণবৈষম্যহীন উদারতা আর দ্বিতীয়ত শাসন ক্ষমতায় থাকা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সধর্মী হয়ে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বাজিকররা কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা আর ছোঁয়াছুঁয়ির বৈষম্যহীন সমাজ লাভের আশার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

দাঙ্গায় মা, ভাই, হারানো হানিফ যখন শারিবার কাছে শোনে যে তারা কোনো ধর্মাবলম্বী নয়, তারা বাজিকর তখন বলে, 'তুমারই ভালো আছেন তুমাদের জাত নাই তুমাদের বেজাতও নাই।' হানিফ একথা তার নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলে, তার নিজের বেদনাময় রক্তাক্ত অতীত তার মনে এ দার্শনিক চিন্তার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বাজিকররা জানে এ অবস্থান তাদের জন্যে কতটা বিপদজনক। নিজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে সবই তাদের জন্যে প্রতিকূল। হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হয়, কারণ দুই পক্ষই যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু বাজিকররা পড়ে মার খায়, তাদের সামান্য পুঁজি বিনষ্ট করা হয়, প্রতিটি নারী ধর্ষিত হয়, কারণ তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে তাদের হয়ে কেউ দাঁড়ায় না। তাদের ধনবল, জনবল কিছুই নেই। তাদের জীবনের সমস্যাবলী যদি তাদের নিম্নবর্গীয় হওয়ার জন্যে হয়, তবে প্রান্তিকায়িত এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং সমাজহীতার জন্যও বটে।

১৯৬৮-৬৯-এ উপন্যাসের আপাত সমাপ্তি ঘোষিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষের রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে তা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাজিকররা নিজের অজান্তেই ভোটের রাজনীতির অঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা আজুরা মণ্ডলের কথা মতো কংগ্রেসে ভোট দেয়। তারা এই দুবারের অভিজ্ঞতায় নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব স্বল্প পরিমাণে আঁচ করতে পারে। কিন্তু লোকগণনায় অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও, ভোট রাজনীতিতে নিজেদের গুরুত্বের অল্পস্বল্প আঁচ সত্ত্বেও তারা কনট্রোল বা রেশন কার্ডের সুবিধা কাজে লাগাতে

পারেনি। বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাদাকিসমৎ এর হিন্দুদের অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করে তাও সম্পূর্ণই সাতষট্টির ভোটকে মাথায় রেখেই প্রস্তুত হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যেতে পারে, ৬২-র নির্বাচন থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ধীরে ধীরে বাড়ছিল। জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদল কংগ্রেস বাংলার সর্বসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিল না। ফলে সাতষট্টির নির্বাচনের আগে থেকেই তৈরি হয় এক টালমাটাল অবস্থা। লেখক তার আভাস আখ্যানে ছড়িয়ে দিয়েছেন রিপোর্ট তৈরি প্রসঙ্গে প্রশাসনের চতুরতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার দীর্ঘদিন পরও ভায়রোর মতো ব্যক্তিরা নিম্নবর্গীয়দের গণ্য করে না মানুষ হিসেবে। কিন্তু সময় ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে তার ইঙ্গিত লেখক আখ্যানে প্রকাশ করেন এভাবে—

> ‘ছেষট্টি সালেও ভায়রোর কাছে এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভিখ মাঙ্গা বাজিকর সোজা চোখে তাকিয়ে বিচার চায়। ....আজ তার তেজারতির সেই বিশাল সাম্রাজ্য নেই, নেই অফুরন্ত ধানের উৎস জমি। বিভিন্ন কারণে এসব তার কমিয়ে আনতে হয়েছে, করতে হয়েছে নানা ঢাকচাপ গোপন বন্দোবস্ত।’[৩১]

আখ্যানের আপাত সমাপ্তির দিকে এসে আমরা দেখি আধি জমির রেকর্ডের কথা আসছে। অপারেশন বর্গার ভয়ে আর আধি জমি দেওয়া হয় না, করা হয় আলগা চুক্তি। মুনিষ-মাহিন্দর কি দিন পাটা হিসেবে কাজ দেওয়া হয়। এভাবে লেখক প্রায় একশ বছরের ইতিহাস আখ্যানে তোলে ধরেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার কারণে তা চিরাচরিত ইতিহাসের পাঠ হয় না। কারণ আধি জমির বর্গার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেখি যে উদ্দেশ্য নিয়ে অপারেশন বর্গা শুরু হয় তা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। বরং বাজিকরদের মতো নিরন্ন দরিদ্র মানুষগুলি আরো বঞ্চিত হয়। অভিজিৎ সেনের লেখন প্রক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথাকার উদয় ভাদুড়ী লিখেছেন—

> ‘.....উত্তর বাংলায় বসবাসের সুবাদে, এক গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কে বেশ কিছুকাল কর্মজীবন কাটাবার সুবাদেগ্রাম সমাজ আর তার মানুষজনের ছবি, ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি, প্রশাসন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাস্তব ছবি অভিজিতের আখ্যানকে ছাপিয়ে ইতিহাস হয়ে উঠেছে।’[৩২]

ছয়

ভারত ভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা লেখকের জীবনে বর্তমান। চেনাপরিচিত জায়গা, আত্মীয়স্বজন মা-বাবা সবাইকে ছেড়ে চলে আসতে হয় তাঁকে শৈশবেই। কলকাতার অনিশ্চয় জীবনযাপনের মধ্যে আত্মপরিচয় সন্ধান, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম তাঁর অভিজ্ঞতায় বর্তমান। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের যাযাবর বাজিকরদের জীবনের বারবার ঠিকানা বদল আর নিজেদের আত্মপরিচয় সন্ধানের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মধ্যে যেন লেখকের অভিজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠে। উদয় ভাদুড়ী 'অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের আয়তক্ষেত্র' নামক প্রবন্ধে লেখেন—

> 'দুই বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়ার করুণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে লেখকের অভিজ্ঞতার স্পর্শ। 'রিফিউজি' তো পশ্চিমবাংলার জনসমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন ছিলো বহুদিন পর্যন্ত। তাদের বাসস্থান ছিলো 'কলোনি'।

'রহু চণ্ডালের হাড়' আখ্যানটিতেও দেখি বাজিকরদের ভাগ্যে বারবার নিয়তির মতো এসেছে উচ্ছেদ। যেখানেই তারা শিকড় চারিয়ে দিতে চায় সেখান থেকে তাদের আবার পথে নামতে হয়। পৌরাণিক কাহিনিতে পুরা ও পালি স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, রহু তার গোষ্ঠী সহ উৎখাত হয় তাদের জায়গা থেকে। তারপর কোনো এক শনিবারের ভূমিকম্প গোরখপুর থেকে দনু পীতেমের দলকে পুবের পথে চালিত করেছিল। তারপর ডেহরিঘাট সিওয়ান হয়ে রাজমহলে এসে যখন তারা ডেরা বাঁধে তখন পীতেমকে ধীরে ধীরে স্থবিরতা আক্রান্ত করেছে। সে স্থায়ীত্বের স্বাদ লক্ষ্মণের মাধ্যমে পেয়েছিল, কিন্তু রাজমহলে এসে তাকে যে স্থবিরতা গ্রাস করে, তার কারণ ছিল তার বার্ধক্য এবং স্বল্প দিনের স্থিতির ফলে পথের জীবনের অনিশ্চয়তার প্রতি জন্মাতে থাকা ভীতি। সে রাজমহল পাহাড়ের গায়ে পাঁচ বিঘা জমির পাট্টা কেনে। কিন্তু সে পাট্টা ছিল ভূয়া। অতএব তাকে আশাহত হতে হয় প্রথম স্থায়ী ঠিকানা তৈরির চেষ্টায়। আবার এভাবে নিরাশ হয়েও সে রাজমহল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না—কন্যা পেমার করুণ মৃত্যুতেও না। অবশেষে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হলে পাঁচ বাজিকর যুবককে পুলিশ জোর করে নিয়ে যাওয়ার পর তারা যখন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ত্যাগ করে সাঁওতালদের দলে যোগ দেয়, তখন আরো একবার পুলিশের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে পীতেম তার দলবল সহ রাজমহল ত্যাগ করে। এবার তারা মালদা শহরে আস্তনা গাড়ে। পনের বছরের মতো সেখানে কাটিয়ে জমিদার বদিউলের দেওয়া জমিতে বাসা বাঁধে। মহানন্দা ও টাঙন নদীর সঙ্গমে জামিলাবাদের নমনকুড়ি গ্রামে তারা ধীরে ধীরে গৃহস্থ কৃষকে পর্যবসিত হতে থাকে যেন। কিন্তু আবার তাদের সেই জমি ছেড়ে আসতে হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ, ঘরে

আগুন, নারী ধর্ষণ, সন্তানের হত্যা সব সহ্য করেও তারা নমনকুড়ি ছেড়ে আসতে চায়নি কিন্তু প্রবল বন্যা তাদের আবার ঠেলে দিল পথের দিকে।

জামিরের নেতৃত্বে এবার তারা পদ্মার তীরে রাজশাহী শহরের বাইরে আশ্রয় নেয়। জামির চেষ্টা করে অঞ্চলের যাবতীয় রীতিনীতিকে আত্মস্থ করতে। শিবাংশু মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন 'অভিজিৎ জামিরকে ব্যবহার করেছেন সিনথেসিস-এর নমুনা হিসেবে'। (পৃ.৪৩/জনপদ প্রয়াস)।

সে রমজানের সহায়তায় তরমুজের চাষ করে। সে জীবন পণ করে নিজের ফসল রক্ষা করতে চায় কারণ সে আর যাযাবর বাজিকরের বৃত্তিতে ফিরে যেতে চায় না। ফলে তরমুজ ভর্তি নৌকা ডুবাতে আসা আক্রমণকারীদের একজনের মৃত্যু হয় তার হাতে। জামিরের জেল হয় সাত বছরের আর আরো একবার বাজিকরদের গ্রহণ করতে হয় তাদের আদিম বৃত্তি। জামির ফিরে আসার পর সে আবার স্থায়ী আবাস, আবাদযোগ্য জমির সন্ধানে নেমে পড়ে। রাজশাহী শহর ত্যাগ করে পাঁচবিবি নামক একটি গ্রামে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। সে কৃষিকাজ বাজিকরদের মধ্যে প্রচলিত করতে চেষ্টা করে। ইয়াসিন সর্দার হয়ে জামিরের স্বপ্ন সাকার করার চেষ্টা করে । কিন্তু আবার বিপর্যয় । আধি জমি হস্তান্তরিত হয়। নিজ হাতে বাঁশাবন ও জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ করা ধান ঘরে তোলার আগেই জমির নতুন মালিক দিগিন মণ্ডল জমি অধিকার করে। রূপার বাজিকরী রক্ত মাতাল হয় আর তার হাতে দিগিন মণ্ডলের একটি লোক খুন হয়। পুরনো কাহিনি পুনরাবৃত হয়। বাজিকরদের ঘর ভেঙে পুড়ে তছনছ হয়, নারীরা ধর্ষিত হয় এবং পাঁচবিবি থেকে উৎখাত করা হয়।

তারপর মোহরের হাটখোলায় এবং কিছুদিন পর মোহরের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দু'পাশে নতুন বসত গড়ে তোলে তারা। সোনামিয়ার সহায়তার সেই বসত জমিটুকু তাদের হয় বটে, কিন্তু তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। তারা রয়ে যায় একই রকম সমাজ বহির্ভূত দরিদ্র এবং অসহায়। এভাবে শেষ পর্যন্ত তারা স্থিতি খুঁজে পায় বটে, কিন্তু যে 'সুস্থিতি'র কল্পনা তারা করেছিল তা মেলে না।

আবার এ তো কেবল তাদের পায়ের তলার মাটি আর মাথার উপরের আচ্ছাদন লাভের কাহিনি নয়, এখানে রয়েছে তাদের আত্মপরিচয় সন্ধানেরও কাহিনি। 'রহু চণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর ঃ একটি আলোচনা' নামক প্রবন্ধে রাহুল দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> 'রহু চণ্ডালের উত্তরসূরিদের অর্থাৎ বাদিয়া বাজিকর গোষ্ঠীর কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই অর্থাৎ আত্মপরিচয়ের একটি চাবিকাঠিও নেই। এদের শুধু রয়েছে রহু চণ্ডালের মিথ এবং থিতু হওয়ার স্বপ্ন। আর রয়েছে তামাম দুনিয়া, কারণ বাজিকর ছিলো সারা দুনিয়ার রাজা। কী যায় আসে, যদি থাকে ছেঁড়া তাঁবু,

শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়, রুগ্ন পশুর দল ? বাজিকরের ছিলো ভরপুর জীবন, বিশাল বিস্তৃতি ! এই মিথ, স্বপ্ন আর বিস্তৃতি, এই তিনেই ছিলো বাজিকরের আত্মপরিচয়।

কিন্তু এই আত্মপরিচয় যে আর যথেষ্ট নয়, তা ক্রমেই বুঝতে পারছিলো বাজিকর। সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছিলো। একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়ে উঠছিলো অসম্ভব। এ কেমন এক অস্তিত্ব যা দিয়ে ভালোবাসা যায় না, বিয়ে করা যায় না, জমিতে ফসল ফলানো যায় না, চাকরি পাওয়া যায় না।'[৩৩]

স্বাধীনতা, দেশভাগ যত এগিয়ে আসছিলো ধর্ম, জাত, দেশ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই বড়ো এবং প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছিল। যদিও বাজিকর যে দেশে যায়, সেই দেশের ভাষা, আচার ব্যবহার শিখে নেয়, নিজেদের ভাষা রীতিনীতির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়; যদিও কালিমাই বিগামাই, ওলামাই, হারুয়ানে প্রভৃতি দেবদেবীরাও তাদের পথেরই সংগ্রহ তবু তারা নতুন গড়ে ওঠা দেশ ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমান কোনো সমাজেই গৃহীত হচ্ছিল না। পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে বাজিকর যে এই পৃথিবীতে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না একথা পীতেম বুঝেছিল। তার পৌত্র জামির চেয়েছিল গৃহস্থ হতে—'চাষি-গেরস্থ। নিজের ভইস থাকবে, হাল-লাঙ্গল থাকবে, ভুঁই থাকবে।' তাই রাজশাহি শহরে এসে সব বাজিকরকে স্থানীয় রীতিনীতি ভাষা, আচার আচরণ শিখতে দেখে সে খুশি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বদলাতে তাই রূপা নিজেকে ভাবে হিন্দু বলে, আর ইয়াসিনের নেতৃত্বে বাকিরা হয় মুসলমান। তারা ভিখমাঙ্গার কাজটাকে আর কাজ বলে ভাবতে পারে না। চাষবাস শিখতে চায় নয়তো চেষ্টা করে অন্যান্য কাজের। তবু জামিরের পৌত্র শারিবার মধ্যে তৈরি হয় টানাপোড়েন। সে ভিখমাঙ্গা বাজিকরদের কৃষক হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে শহুরে শ্রমিকে পরিণত হয়। তবু সে নিজেকে বাজিকর ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। সে তার শতাব্দী প্রাচীন অভিজ্ঞতার প্রত্ন স্মৃতি নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বে ভোগে। সেভাবে—

'রহুকে যারা রক্তের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই দনু, পীতেম, জামির, এরা কি বাজিকরের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতে চেয়েছিল, না চেয়েছিল বাজিকর সবার সঙ্গে মিলেমিশে এককার হয়ে যাক ? রূপা কিংবা ইয়াসিন ঠিক কাজ করেছে, না পৃথক অস্তিত্বের দম্ভ নিয়ে শারিবা ঠিক কাজ করেছে ?'[৩৪]

রহুর পুরাকথাকে সঙ্গে করে যে বাজিকর স্থিতির স্বপ্ন দেখত তা তাদের এই স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় যেন। এই স্থিতি লাভের আগেও সব বাজিকর জানত রহু চণ্ডালের হাড় কথাটাই বুজরুকি। তবু সব বাজিকরই তার স্বপ্ন দেখত ও বিশ্বাস করত তার সার্থক অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি

শারিবা নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান না ভেবে বাজিকর ভাবলেও অন্যান্যরা রহুকে ভুলেছে। এমনকি শারিবা নিজেও বুঝতে পারে—'হতাশার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর রহু চণ্ডালের হাড় খুঁজবে না'। তাই রাহুল দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> 'বাজিকর তার কাল্পনিক দেশ ও স্থিতি ফিরে পায়। কিন্তু কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র সূত্রটি হারিয়ে যায়। বাজিকর রহুকে ভুলে যায়। কিন্তু কিংবদন্তীটিও যেন শেষ পর্যন্ত কিংবদন্তী থাকে না, ইতিহাসের রুক্ষ জমিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। যতক্ষণ যাত্রা থাকে, ততক্ষণ কিংবদন্তীও থাকে, যাত্রা শেষ হওয়া মাত্র কিংবদন্তী ফুরিয়ে যায় এবং ইতিহাসের শুরু হয়। আর ইতিহাস যখন শুরু হয়, রহুও তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।'[৩৫]

একই প্রবন্ধে শ্রী দাশগুপ্ত মহাশয় লিখছেন —

> 'রহু যে স্থিতির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনে তা অধরাই থেকে যায়। বাজিকর গোষ্ঠীও তাই রহুকে ভুলে যায় এবং মিথ্যা ভারতবর্ষের চিরদাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ এক ভুঁয়ো আত্মপরিচয়ে স্বাক্ষর করে জাত-ধর্ম-রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী উপনিবেশকারী ক্ষমতাবাদের কাছে আত্মসমর্পন করে।'[৩৬]

আবার বাজিকরদের সব নিজস্বতা হারিয়ে পরিচয় খুঁজে বের করার এ প্রক্রিয়াকে 'Formal Elaboration of Social Hierarchy' তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন শিবাংশু মুখোপাধ্যায়। 'রহু চণ্ডালের হাড় ও সোশ্যাল ইলাবোরেশনের একগুঁয়ে গপ্পো' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন —

> 'কেন্দ্রের ডিজাইন অনুযায়ী আমি নিজেকে সাজাই আমি, আমার পরিবার - সমাজ- রাষ্ট্র বাঁধা থাকে এক সূত্রে। মোদ্দা কথা পীতেম ভায়ার দল 'নেশন স্টেটে' আশ্রয় চাইছে। বিশেষত যখন থিতু হওয়ার কথা পীতেম ভেবেছে — তখন তাদের তো একটা সহজ সমীকরণে জাস্টিফায়েড হওয়া দরকার। যেমন, নেশন — স্টেট হতে গেলে যে 'সমসত্ত্বতা" কার্যকর যার দ্বারা একটি কৌম তার একটি কল্পনার ভূগোল তৈরি করতে পারে — তা হতে পারে ধর্মীয় এককতা বা ভাষা - একমাত্রিকতা। যে কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ ভারতবাসীর ইনার ডোমেইনে এক মাত্রিকতার কোন আখ্যান নেই। সবটাই কল্পিত এবং এস্যেন্সিয়াল। প্রান্তিক কৌমগুলোকে সেই প্রধান কোন নেশন-স্টেটে আশ্রয়

নিতে গেলে ‘‘কল্পনার’’ হিসেব নিকেশ জানতে হয়। সেই কল্পিত ঘরে আশ্রয় নিতে গেলে — নিজের সংস্কৃতি আচার ব্যবহার এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হয় — যাতে পিতা নেশন-স্টেটের কোনো কনট্রাডিকশন না থাকে। পিতার একটি বৃহৎ ছাতার তলায় সেঁধিয়ে প্রশ্নহীন আনুগত্যে শুধু ইতিহাস পড়ে যাও।’[৩৭]

বাজিকররাও আশ্রয়, স্থিতির লোভে প্রশ্নহীন আনুগত্যের জোয়ালে নিজেদের বেঁধে ফেলে। কিন্তু ‘প্রশ্নহীন আনুগত্য’ বা ‘ক্ষমতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ’ দিয়েই আখ্যান শেষ হয় না। শারিবার মাধ্যমে যেন বজায় থাকে চির-অনুসন্ধানী, চির-প্রতিবাদী সত্তা। যে প্রথমে কল্পিত স্বর্গের মৃত্যু পরবর্তী সুখের স্বপ্ন বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেছিল সেই সরকারি চাকরি হবে না জেনেও নিজের ধর্ম লেখায় ‘বাজিকর’। তার মনে প্রশ্ন জাগে, যদি বাজিকর কোনো আলাদা ধর্ম না হয় ‘তবে কেন এত লাঞ্ছনা’। সে এখন রহু চণ্ডালের হাড়ের ইন্দ্রজালে নিজেদের সুখের চাবিকাঠির সন্ধান করে না — তার বিশ্বাস হয়তো বা পুরুষাকারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অনুভব করে ‘রহু যেন তার রক্তের মধ্যে ঢুকে বসে আছে’ (পৃ ১৪২)। আর তাই ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ মর্মান্তিক লাঞ্ছনা, প্রতাপের কাছে আত্মসমর্পণের একমাত্রিক আখ্যান থাকে না। তাত্ত্বিক প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য রহুকে রক্তের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে শারিবার জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে —

‘নিদালির ঘোর কাটিয়ে গতির আবেগ সৃষ্টি করা আর উপযোগী পথ খুঁজে নেওয়া সাম্প্রতিক উপন্যাসের দায়, এই বার্তা যেন আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চান অভিজিৎ।’[৩৮]

রহু চণ্ডালের হাড়’-এর মতো অনেকার্থদ্যোতক উপন্যাসকে তাই কেবল বাজিকর নামক কৌম গোষ্ঠীর রাষ্ট্রের অধীনতা গ্রহণের কাহিনি বলে সরলীকরণ করা যায় না, বা আত্মপরিচয় সন্ধানে নেমে বাজিকরদের ভুয়ো পরিচয় লাভের কাহিনি বলেও উপসংহার টানা যায় না। এ যেন শেষ পর্যন্ত ও ক্লান্তিহীন সন্ধানেরই আখ্যান। পুনরুল্লেখের দোষ স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় এখানে মূল্যবোধের পরিবর্তন, চিন্তাধারার পরিবর্তনের ছবি এসেছে। রয়েছে এক বিস্তৃত এলাকার রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত। আবার আখ্যানকারের কাছে যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই-ই বর্তমান সময়ের প্রলম্বিত রূপ, তাই আখ্যান তাঁর হাতে হয়ে ওঠে মিথ, ইতিহাস ও বর্তমানের সংযোগ স্থল। তাই ‘রহু চণ্ডালের হাড়’কে আবহমান কালের উপন্যাস অভিধা দেওয়া যেতেই পারে। যেখানে চিরপ্রবহমান সময় পরিবর্তনশীল পরিসর কল্পনায় সম্পৃক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নব তাৎপর্যের গ্রন্থনা।

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর

বর্তমানের ব্যতিক্রমী লেখকরা প্রেমকে উপজীব্য করে কোনো আখ্যান সাধারণত লেখেন না। প্রেম বিষয়ক উপন্যাসের উপর একচেটিয়া অধিকার জমিয়েছেন সেই লেখকরা যাঁরা 'বাজারে কী চলে' তার উপর নির্ভর করে লেখনী ধারণ করেন। আর সে ধরনের উপন্যাসে প্রেম, যৌনতা, বিকার, সন্ত্রাস ছদ্ম বাস্তবতার এক মায়াজালে মদির করে তোলে ধরা হয়। চিন্তা ভাবনার রসদ যোগানোর বদলে সেই উপন্যাসগুলি তৈরি করে চেতনার ঘুম পাড়ানিয়া গান। বোধ হয় তাই যে সব লেখকরা নিজেদের চলতি স্রোতের পন্থী করে তুলতে চান না, তাঁরা মানবমানবীর প্রেমকে আখ্যানের প্রধান বিষয় হিসেবে মর্যাদা দেন না। অভিজিৎ সেনকে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কথাকারদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলা যেতেই পারে। কারণ তাঁর নিজের মতানুসারে 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' প্রেম বিষয়ক উপন্যাস। কিন্তু তা বলে উপন্যাসটি কোনো অর্থেই কেবল মাত্র অবসর বিনোদন পাঠ্য প্রেমকাহিনি নয়। যদি হত তবে আখ্যানটিকে চিহ্নিত করতে হত অভিজিৎ সেনের একটি ব্যর্থ রচনা হিসেবে। কিন্তু তা করা তো হয়ই না বরং এটির স্থান নিধারিত হয়েছে অভিজিৎ সেনের অন্যতম উপন্যাসগুলির মধ্যে। আর সেই সঙ্গে স্বয়ং লেখকের পছন্দের উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর।'

বহুত্ববাদী এ সময়ে আমরা উপন্যাসে কেবল কাহিনির মায়াজাল চাই না, আমরা খুঁজি তাৎপর্য। কারণ উপন্যাস হল জীবন ও পরা-জীবন, বাস্তব ও পরা-বাস্তবের আখ্যান, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাধ্যম। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আখ্যান ভাবুক বাখতিন অন্যান্য সাহিত্য মাধ্যমের মধ্যে উপন্যাসের বিশেষত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে—

> 'The kind of text we have came to call 'the novel' has been most at pains to establish its generic identity not only relative to other literary genres, but as it relates to the norms of everyday speech, which are the bases of genre formation itself. And it does this by flaunting or displaying the variety of discourses, knowledge of which other genres seek to suppress. What marks the novel as distinctive within the range of all possible genres (both

literary and non-literary, as well as primary or secondary) is the novel's peculiar abitity to open a window in discourse from which an extra ordinary variety of social languages can be perceived. The novel is able to create a work space in which that variety is not only displayed, but in which it can become an active force in shaping cultural history.[১]

বাখতিন আরো বিশদ করে বলেছেন উপন্যাসের 'Romannost' অর্থাৎ 'উপন্যাসত্ব' কীসের উপর নির্ভর করে এবং কীভাবে উপন্যাসে জেগে ওঠে নানা স্বরের উপস্থিতিতে heteroglossia। তিনি বলেন—

'উপন্যাসের 'উপন্যাসত্ব' অর্থাৎ তার মৌল নির্যাস নির্ভর করে সামাজিক সংবিদ, সাংস্কৃতিক আয়তন ও ভাষা ব্যবহারের দ্বিবাচনিকতায়। সাহিত্যের পাঠকৃতি মূলত সামাজিক উচ্চারণ হওয়াতে তাকে নির্দিষ্ট সময় ও পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। এইজন্যে লেখকের লিখন প্রতিভার ওপর উচ্চারণের বয়ন ও সার্থকতা নির্ভর করে না পুরোপুরি, পাঠকৃতি যখন নির্মিত ও গৃহীত হয়, যেসময় সামাজিক ইতিহাসের টানাপোড়েন উচ্চারণকে অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করে। সূত্রধার ও গ্রহীতার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক স্তরে-স্তরান্তরে যত পাল্টে যেতে থাকে, পৃথক ও সমান্তরাল অস্তিত্বের আততি তত প্রবল হয়ে ওঠে। উপন্যাসে এই প্রক্রিয়া সর্বত্র অনুভূত হতে থাকে, লেখক তাঁর চরিত্র ও পাঠকেরা সমান্তরালভাবে অবস্থান করে বলে স্তরে-স্তরান্তরে তাৎপর্যের মধ্যে নানা ধরনের অভিঘাত তৈরি হয়। তাই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় তাৎপর্য থাকলেও আরো অনেক গৌণ তাৎপর্যের সঙ্গে দেখা দেয় অন্তর্বর্তী দ্বিবাচনিকতা। সম্পর্কের এই জটিল বিন্যাসে শুধুমাত্র কথনবিশ্বে উচ্চাবচতা দেখা দেয় না, নানা স্বরন্যাসের বিভঙ্গে অনেকার্থদ্যোতনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়।'[২]

বাখতিন উপন্যাসকে একবাচনিক ও দ্বিবাচনিক দুধরনে বিভক্ত করে জানিয়েছেন— শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মাত্রেই দ্বিবাচনিক। এধরনের উপন্যাসে বহুস্বরের সমাবেশ ঘটে এবং প্রতিটি স্বরই হয় সার্বভৌম, সুসঙ্গত। অর্থাৎ সার্থক প্রতিবেদন মানেই তা হবে দ্বিবাচনিক, অনেকার্থদ্যোতক, তাৎপর্যের নব সংযোজক আবার

সেই সঙ্গে পণ্যায়নের প্রতিস্পর্ধী, স্থিতাবস্থার অবসানকামী। এসময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক সমালোচক ও তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন—

> ‘প্রকৃত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের স্বভাবধর্ম হল চিহ্নায়নের রূপান্তর এবং লেখার মুক্ত পরিসর। অন্যভাবে বলা যায়, সঞ্চরমান পাঠকৃতি খাঁটি প্রতিবেদনের নিদর্শন। এই জন্যে তা প্রায়োগিক নিরীক্ষায় ক্লান্তিহীন এবং সমস্ত ধরনের প্রতাপ অর্থাৎ আধিপত্য প্রবণ উপস্থিতিকে অস্বীকার করে। উপন্যাস এই যুগের মহত্তম মানবশিল্প। কোনো যথার্থ মানবিক প্রতিবেদনে একক নিয়ন্তা অস্তিত্ব থাকতে পারে না কখনো। এইজন্যে সার্থক উপন্যাস আমরা তাকেই বলব যাতে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট কেন্দ্রীভূত সত্যের একরৈখিক বিচ্ছুরণ নেই। বর্গ-বর্ণ-লিঙ্গগতভাবে নিপীড়ন যেহেতু বাঙালির ভাববিশ্বে পরিচিত অভিজ্ঞতা---কখনো উপনিবেশোত্তর চেতনা, কখনো নিম্নবর্গীয় চেতনা, কখনো নারীচেতনা প্রতিবেদনের উৎসভূমি। পৌর সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চিত বহুদিনকার পূঞ্জীভূত অন্ধকার এখন বাংলা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপলক্ষ, যদিও মুখ্য আধেয় নয়।’[৩]

অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ (১৯৯৫) যথার্থ প্রতিবেদনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সবই অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। এর প্রতিটি বিন্যাসে রয়েছে তাৎপর্যের নব গ্রন্থনা, ছদ্ম বাস্তবতার বিপরীতে পরা বাস্তবতার জগৎ । তাই প্রেম ও যৌনতা থাকা সত্ত্বেও প্রথাগত প্রেমকাহিনির বিপরীতে এটি হয়ে উঠেছে এক যথার্থ ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য এই উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন—

> ‘গ্রামীণ সমাজের গভীরেও যে প্রতাপের প্রকরণকে বিনির্মাণ করার প্রক্রিয়া চলেছে এবং একাজে প্রেম ও যৌনতা বিস্ফোরক বারুদ হিসেবে কার্যকরী ঔপন্যাসিক সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।’[৪]

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকায় ‘বালা লখিন্দর’ নামে প্রকাশিত গল্পে বীজাকারে আলোচ্য উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ। তারপর গ্রন্থাকারে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান চেহারায় আখ্যানটি প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প এবং উপন্যাস দুটিকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে দেখি ছোটগল্প থেকে উপন্যাসের এই যাত্রা কেবল পরিসরের জ্যামিতিক বিস্তৃতি নয় নান্দনিক দিক থেকেও তা একটি নতুন মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যাধরী লখিন্দরের কাহিনির সঙ্গে বিদেশী-বকুলবালা-সরস্বতী-সনেকার গল্প আখ্যানে প্রবেশ করেছে এবং বিদ্যার সূত্রে তা উপন্যাসে সংলগ্ন হয়েছে। আর নতুন বৃত্তান্তটি যেমন উপন্যাসের শৈলীতে

অভিনবত্ব যোগ করেছে তেমনি আস্বাদে এনেছে নতুন মাত্রা। আবার বালা লখিন্দরের সূত্রে আখ্যানে এসেছে শৈলী কানাই এর আরো একটি ভিন্ন বৃত্তান্ত।

সম্পর্কের বৈচিত্র্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। কারণ যে সত্তাকে উপন্যাস ধরতে চায় সে অপরতার প্রতিবিম্বেই তো বিম্বিত হয়। ডস্টয়েভস্কির নন্দন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাখতিন জানিয়েছেন—

> To be means to be for another and through the other for oneself. A person has no soverign internal, he is wholly and always on the boundary, looking inside himself, he looks into the eyes of another or with the eyes of another.[৫]

আবার জীবনের যে অনন্ত অসীম ধারাবাহিকতা উপন্যাসের অন্বিষ্ট তা অসংখ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র এককেরেই সমষ্টি। ফলে একমাত্রিক হলে উপন্যাস কখনোই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। অনেক স্বরের সম্মিলনে, বহু অন্তবর্য়নের বুনটেই তৈরি হয় উপন্যাসিকতা।

আলোচ্য উপন্যাসটি অনেকার্থদ্যোতক ও দ্বিবাচনিকতায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে । এইভাবে বিচিত্র জটিলতাকে আত্মস্থ করেই। আবার এই জটিলতাকে উপন্যাসে তুলে আনার জন্যে অভিজিৎ সেন গ্রহণ করেছেন এক ভিন্ন রচনা প্রকরণ। কারণ প্রচলিত প্রকরণের মধ্যে উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনায় নিষ্ণাত চিন্তাধারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সেজন্যে মিথ ও লোককথা আসে আখ্যানে, আসে ভারতীয় সাহিত্যের কাহিনির মধ্যে কাহিনি তার মধ্যে আরো অন্য কাহিনি বলে যাওয়ার ধরনটি। অনস্বীকার্য যে ভারতীয় এই উপাদানগুলিকে বাংলা উপন্যাসে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয় সত্তরের দশকের পর থেকে। বাস্তবকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার নামে এর আগে যে ছদ্ম বাস্তবতাকে আখ্যানের বিষয়বস্তু করে তোলা হয়েছিল তা থেকে সরে আসার জন্যে এ সময়ের আখ্যানগণকার বাস্তবের সঙ্গে অধিবাস্তবের সংযোগ ঘটিয়েছেন। অভিজিৎ সেন এ সম্বন্ধে নিজে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

> '...স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যপূর্ণ লেখার প্রাগৈতিহাসিক মিথের ব্যবহার সাহিত্যিক ভাবনার নতুন দিক খুলে দেবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে মিথ বা লোককথার বহুমাত্রিক ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে এখনো খুবই নতুন। সত্তর দশকের 'গ্রামে চলো' ব্যাপারটা অন্য অনেক কিছুর মতো শিল্প সাহিত্যেও একটা ওলোটপালোট করেছে মনে হয়।...ফলে অন্য মাধ্যমগুলোর মতো গল্প উপন্যাসেও একটা অবলম্বন আমরা খুঁজতে চেয়েছি যা ঠিক ইউরোপীয়

নয়। ভারতবর্ষীয় মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান, পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূম উত্তরবঙ্গের উপভাষা এমন কি কোনও উপভাষার ঢঙে তৈরি কৃত্রিম বাক্‌রীতিরও ব্যবহার আজকাল লেখাতে আমরা করি। ...ইউরোপীয় নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের গল্প উপন্যাস কবিতার সঙ্গেই এই নতুন বিষয় ও রীতির মিল। ...লোককথা, লোকসঙ্গীত এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্থ করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত—সবাইকে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্লাবিত করা যায়।... আধুনিক বাস্তবতার যতরকম রূপ আছে, তার সব কটির মধ্যেই গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে সুদ্ধ জীবনবোধকে ধ্বংস করার প্রবণতা আছে বলে, অনেকের মত আমারও মনে হয়। ... সুস্থ জীবনবোধ জাগ্রত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা কিংবা লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করে নিয়ে আসতেই আমার এবং আমার মত আরো অনেকেরই লক্ষ্য থাকবে। ... লোককথা, লোককথার ঢং মিথের অলৌকিক বাস্তবতা—এসবের মধ্যেই নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান হয়ত পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে আমাদের সাহিত্যের বর্তমান বন্ধ্যাদশা হয়ত ঘুচতে পারে।'[৬]

(মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা)

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-এ বিদ্যার সূত্রে সরস্বতী-বিদেশী-বকুলবালা সনকার কাহিনি যখন সংযুক্ত হচ্ছে তখন দেখি লেখক এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করে তাকে মিশ্রিত করছেন মূল আখ্যানের সঙ্গে। বিনুনির মতো কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে দেখেছি শৈলীর কাহিনি, কানাই এর কাহিনিকে। কিন্তু বিদেশীর কাহিনিকে উপস্থাপিত করেছেন লেখক লোকনাট্যের প্রকরণে—যা বালা দেখছে এবং দেখতে দেখতে সে অনুভব করছে এক অদ্ভুত ধরনের একাত্মতা—

'বছর খানেক আগে বালা এই পালা শেষবারের মত দেখছিল। শেষ হয়ে যাবার পরও বাকি সময়টুকু বালা মঞ্চের ফাঁকা জায়গাটুকুর দিকে তাকিয়ে মুহ্যমানের মত বসেছিল। তার খরদৃষ্টি আর কিছুই দেখছিল না, দেখছিল শুধু শূন্য মঞ্চটুকু। সেই শূন্যমঞ্চ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে মায়ামঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সেই মায়ামঞ্চে সে বিদ্যাধরীকে দেখল।... সে ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে এই পালার কাহিনির ভিতরে বালা লখিন্দরও ঢুকে পড়েছে। তার আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই।'[৭]

শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকে হ্যামলেট তার পিতার হত্যার ঘটনাটিকে মঞ্চস্থ করেছিল হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্যে। সেই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। হ্যামলেটের মা ও পিতৃব্য উভয়েই সেই মঞ্চস্থ নাটকটিকে দেখে নিজেদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকার করে নিচ্ছেন অপরাধ। এখানে বালা লখিন্দরও নাটক দেখেছে, দেখে একাত্ম হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও আমরা লক্ষ্য করি এ দুই ঘটনার মধ্যে কতটা পার্থক্য। যদিও দুটো পাঠকৃতিতেই আমরা লক্ষ্য করছি text within text। কিন্তু ‘হ্যামলেটে-এ যা পরিকল্পিত তা এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। বালাকে বিদ্যার অতীত সম্বন্ধে জানানোর জন্যেই যাত্রাপালাটি মঞ্চস্থ হয়নি। লোকনাট্যের সাম্প্রতিককে নাট্য মাধ্যমে প্রকাশ করার যে ধারা সেই ধারা অনুযায়ী বিদেশী সনকার কাহিনিকে পালার আকার দেওয়া হয়। আবার বিদেশী সনকা-বকুলবালার কাহিনি যে কেবল পালার সাহায্যে আখ্যানে এনেছেন লেখক, তাও নয়। এক অদ্ভুত অথচ আকর্ষণীয় ঢঙে বর্ণিত হয়েছে পুরো উপন্যাসটিতেই। লেখক এই বিচিত্র জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে —

> ‘এই জটিল গল্পটা মহেন্দ্র বলেনি বালাকে। এই জটিল গল্পটা বিদ্যাধরীও বলেনি বালাকে। অথচ তারা দুজনেই বালাকে কিছু কিছু বলেছিল। মহেন্দ্র আর বালা কাছে দূরে কোথাও গান হলে অবশ্যই শুনতে যেত। বছর পাঁচেক আগে বাঁশোর-এর পলিয়া রাজবংশীরা ‘‘সনেকাশোরী-বিদেশীবাউদিয়া’’ নামে খনের গান বেঁধেছিল। সেই খন আসরে খুব আগ্রহ সৃষ্টি করলে পরের বছর মুর্শিদাবাদের জামাল রায়বেশিয়া পঞ্চরস আলকাপ পালা নামাল ‘‘সনেকা-বিদেশী ডবল মার্ডার’’ এই নামে। সে পালাও খুব নাম কিনল বালা আর মহেন্দ্র এই দুই গান একাধিকবার দেখেছিল।’[৮]

এইভাবে স্মৃতির টুকরোয় কখনো মঞ্চের চরিত্রের অভিনয়ে ফুটে উঠেছে এই উপকাহিনিটি। যা ‘বালা লখিন্দর’ নামক আদিপাঠে ছিল না এবং যা ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, উপন্যাসটিতে যোগ করেছে একটি নতুন মাত্রা। শৈলীর বিচারে এধরনটি একেবারে অভিনব। দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে আক্ষেপ করে তাঁর ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেল আমাদের নিজস্ব কাহিনি বলার ধরনকে নষ্ট করে দিয়েছে। পাঁচালি, কথকতা, কবিগান কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমেও তো কাহিনি বলা হত। কিন্তু তার সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের আর কোনো শিকড় রয়নি। মঙ্গলকাব্য, কথকতার ঢঙটি হারিয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের ধার দেওয়া রুচির চাপে। কিন্তু তিনি এই সত্যের কথাও উল্লেখ করেছেন যে—

> ‘....ভারতবর্ষের মত দেশে লোকজীবনও এত বিচিত্র জটিলও বিস্তৃত যে

সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত মধ্যবিত্তও তা শেষ করে দিতে পারেনি।'[৯]

তাই রচিত হয় 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-এর মতো আখ্যান যেখানে উত্তরবঙ্গের লোকজীবন উপস্থাপিত হয় তার সম্পূর্ণ রঙ-রূপ রস নিয়ে। আর বিশেষত আমরা তো জানিই, উপন্যাসই হল একমাত্র শিল্পমাধ্যম যেখানে গান, কবিতা, নাটক সব কিছুকেই মিশ্রিত করার অবকাশ আছে। অভিজিৎ সেন সেই স্বাধীনতার সুযোগ্য ব্যবহার করেছেন। তাই আখ্যানে যেমন আলকাপের দু-এক কলি গান ব্যবহার হয়েছে, তেমনি এসেছে সময় নিয়ে আশ্চর্য অভিনব ব্যবহার। প্রত্যেকটি ঘটনাকে অণুমুহূর্তে ভাগ করে নিয়ে সেগুলোকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এমনভাবে যাতে একটি ঘটনা চলার মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ অতীত বলা হয়ে গেছে। ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির যে ধরনের ব্যবহার আমরা সাধারণত দেখি, এ ঠিক তেমনটি নয়। বর্তমানের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে অতীত, আবার ফিরে আসে বর্তমান এভাবেই যদি হত তাহলে তা হত চিরাচরিত পদ্ধতি। কিন্তু অভিজিৎ এই আবর্তনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। বারবার ঘটেছে বর্তমানের মধ্যে অতীত ও অতীতের মধ্যে বর্তমানের প্রবেশ। পঞ্চায়েতের বিচারে আখ্যানে শুরু এবং বিচার শেষে আখ্যানেরও শেষ। কিন্তু তারই মধ্যে বিদ্যার অতীত, বালা ও বিদ্যার সম্পর্ক ইত্যাদির কথা জানানো হয়েছে আবার বিচারও এগিয়েছে। এভাবে লেখক মান্য রচনাভঙ্গিকে ধস্ত করে দিয়ে খেলতে থাকেন ভাঙা গড়ার খেলা। আর এভাবে একটি ছোটগল্প কেবল চেহারায় অর্থাৎ আকারে বড়ো হয়ে ওঠে না— হয়ে ওঠে যথার্থ একটি উপন্যাস — আকারে এবং প্রকারে।

'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ অভিজিৎ সেনকে বাস্তবের সঙ্গে অধিবাস্তবর যে ছবি আঁকতে দেখেছি তা বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর-এ এসে বিস্তৃততর হয়েছে। শহরে মধ্যবিত জীবনের সমস্যা, পণ্যায়ন ও বিশ্বায়নের বিজ্ঞাপনে উদ্ভাসিত জগতের উল্টো দিকে অবস্থিত প্রান্তিকায়িত অপরদের কথা অভিজিৎ সেন তাঁর পুরস্কারজয়ী উপন্যাসে কেবল নয়, প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-ও উত্তরবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের পটভূমিকায় রচিত। আখ্যনটির কাহিনি সূত্র খুব সংক্ষেপে বলতে হলে বলা যায় দুটি পুরুষ ও নারী একে অপরকে ভালোবেসে সমাজ পরিবার ইত্যাদি সব রকমের বাঁধনকে ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই সাধারণ কাহিনিতে যোগ হয়েছে অসাধারণ কিছু দিক। উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের প্রতিটি দিক যেন আখ্যানে ফুটে উঠেছে এই কাহিনি সূত্র অবলম্বন করে। আবার প্রধান চরিত্র দুটির অনুসঙ্গে এসেছে প্রত্নকথা। ফলে তৈরি হয়েছে কুহকী বাস্তবতার, অদ্ভুত আলো আঁধারী জগতের। আসলে এভাবে আজকের আধুনিকোত্তর লেখকদের মতোই অভিজিৎ সেনও চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের প্রাকৃতায়ন এবং প্রাক্ ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন এবং স্থান দান।

আখ্যানের পরতে পরতে মিশে যায় লোকবিশ্বাস, প্রত্নকথা। বালা লখিন্দর নামেই লুকিয়ে থাকে লোকবিশ্বাসের ছোঁয়া। সে মনসার বর। বিষহরির দান তাই তার কলার ভেলায় চাপাতেও মানা। যেন চরিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করে নাম। তাই যেন ফুটে ওঠে শৈলীর মন্তব্যে 'আকির ছেলের নাম রাখিছিস লখিন্দর' (পৃ.২৭৬)। তারপর লেখকই জানিয়ে দেন—

> 'কোথায় যেন একটা মিল আছে। স্মৃতিতে সত্তায় অস্তিত্বের গোপন অভ্যন্তরে বিশ্বাসে কিংবদন্তীতে ওতপ্রোত একটা টোটেম যেন নিয়তি স্থির হয়েই আছে।'[১০]

বালা লখিন্দর নামটির আক্ষরিক অর্থটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। 'বালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হয় 'পুত্র' তবে আঞ্চলিক অর্থে 'বিপদ'। আর লখিন্দর বা লখাই, যে চাঁদ সওদাগরের পুত্র ছিল, তারও বিপদ হয়েছে জীবন সংশয় হয়েছে। আবার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যাধরী নামটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে কাহিনি। কামাখ্যা দেবীর সেবিকা তন্ত্রসাধিকাদের বিদ্যাধরী বলা হয়। যাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। আলোচ্য আখ্যানের অন্তিমে এসে কী আমরা বিদ্যাধরীর সেরকম ক্ষমতাই লক্ষ্য করলাম না। সমাজ পরিবারের বাঁধনকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তো সেই দিয়েছে বালাকে। শক্তিসাধিকার নাম তো সে পেতে পারে বলেই মনে হয়।

আখ্যানে উদ্দিষ্ট খণ্ড সময়ের নদী যেন মিশে যায় মহাসময়ের সমুদ্রে। বালা লখিন্দরের নামের সূত্র ধরে দুটি ঘটনা—যেটি ঘটছে এবং যেটি ঘটেছিল হয়তো বহু আগে এক সুদূর অস্পষ্ট অতীতে, তাদের মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেবল লখিন্দরের চরিত্রটি নয় রাজকিশোর আর মায়নোমতির মধ্যে পাই চাঁদ সওদাগর আর সনকার ছায়া। চাঁদ সওদাগর যেমন ব্যবসায়ী তেমনি রাজকিশোরও। পুত্র লখিন্দরের জন্যে উভয় দম্পতিই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছেন। চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর স্নানের ঘাটে মামি কৌশল্যাকে বলাৎকার করে সামাজিক ট্যাবুকে ভেঙেছে আর রাজকিশোর পুত্র বালা লখিন্দর বিদ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সামাজিক ট্যাবুকে ভেঙেছে। অন্যদিকে বিদ্যাধরী ও লখিন্দর দুজনকে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রত্নকথার বেহুলা-লখিন্দরের সঙ্গে। তাই কবিরাজের মৃত্যুর রাতে বিদ্যাধরীকে নিয়ে যখন বালা নদীপথে যাত্রা করে তখন প্রত্নকথার যেন পুনর্জীবন লাভ করে—

> 'চাঁদের আলোর এই অপার্থিব মুহূর্তে হঠাৎ তাকে দৈবপুরুষের মত মনে হল বিদ্যার। সে মুগ্ধ হয়ে তাকাল তার পুরুষটির দিকে।....চারদিকে স্তব্ধ গভীর রাতে নদী-মধ্যকার অপরিচিত নিসর্গ বিদ্যাধরীকে কেমন বিহ্বল করে দিল। কতকাল আগে সে যেন ভেসেছিল আরেকবার? সে কত জন্ম আগে? সে কি এই মানুষের সঙ্গে? মাছ, মকর, ঘড়িয়াল-কুমির পালে পালে শিশুমার ধেয়ে

এসেছিল যে পচনধরা দেহটির লোভে, সে কি ওই দিব্যপুরুষটির, যার মাথা এই মুহূর্তে গাছপালা ছাড়িয়ে নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে? ভয়, হতাশা, হাজার প্রলোভন জয় করেছিল কি বিদ্যা এই পুরুষের পথ চেয়েই?'[১১]

প্রজন্ম লালিত স্মৃতি ও কল্পনা বিদ্যাধরীকে যেমন সে মুহূর্তে বিহ্বল করে ঠিক তেমনি প্রভাব বিস্তার করে বালা লখিন্দরের উপরও। সে বলে—'ভয় নাই বিদ্যা, হামার নাম বালা লখিন্দর।

এ যাত্রায় তুমি সওয়ারি, হামি চড়নদার! আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ করমো।'[১২]

বিদ্যা ও লখিন্দরের এই যাত্রা তো আসলে পারিবারিক সামাজিক প্রতাপের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী যাত্রা। তারা মেনে নেয়নি চাপিয়ে দেওয়া কোনো প্রথাকে। এই যাত্রায় বেহুলা লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে জলে ভাসেনি। এবারের যাত্রা 'প্রতিদিনের ক্ষুদ্র মৃত্যু থেকে গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া উজ্জীবনের দিকে যাত্রা' (পৃ. ১৯১/ উপন্যাস প্রতিবেদন) পারিপার্শ্বিকতার যে বাঁধন, প্রতাপের চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসন তিলতিল করে স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন চিন্তাধারাকে ধ্বংস করে, সেই বন্ধনজালকে ছিন্ন করেছে, অনুশাসনকে অমান্য করেছে বিদ্যাধরী এবং বালা লখিন্দর একে অপরকে ভালোবেসে। প্রত্নকথা অনুসারে বেহুলা লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করেছিল বিভিন্ন বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে। আর এ উপন্যাসে বেহুলা লখিন্দরের প্রত্নকথাকে নতুন চেহারার তুলে আনা হয়েছে। এবার লখিন্দর যেন বেহুলার ঋণ শোধ করছে। দুজনেই দুজনকে নবজীবন দান করছে—সত্তার নবজীবন। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে এ যেন তাদের অনোন্যপুনর্জন্ম। আসলে বর্তমান যুগের আখ্যানে মিথকে প্রয়োগ করা হয় ব্যঞ্জনার সাহায্যে। তাই লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের ঘটনাটি এখানে আগে সত্তার পুনর্জন্ম হিসেবে। তাদের মানব সত্তার উপর চেপে বসেছিল হাজারো শৃঙ্খলা। সেখান থেকে তারা দুজনে বেরিয়ে আসে প্রেমের শক্তিতে। এভাবে বার বার বাস্তবের সঙ্গে মিশে যায় মিথের স্বপ্ন ও কুহক। এভাবে মহাসময়ের ছায়া যেমন খণ্ডসময়ে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি খণ্ডপরিসরে আবদ্ধ থাকে না উপন্যাসের পরিসর। ক্ষুদ্র গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে আখ্যানের এক ভিন্ন দ্যোতনা তৈরি হয়। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

'স্পষ্টত উপন্যাসের এই গ্রন্থনায় মহাসময় ছায়া ফেলেছে সময়ে, মহাপরিসরের দ্যোতনা বারেন্দ্রভূমির গ্রামের গন্ডিকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। এই দ্বিবাচনিকতায় জন্ম নিয়েছে আশ্চর্য সজীব অধিবাস্তবতা তৃতীয় বিশ্বের নিরিখে যাকে বলতে পারি ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার অভিব্যক্তি।'[১৩]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে ঐন্দ্রজালিক বাস্তব হল,

‘....a kind of narrative raw material derived essentially from peasant society and drawing in sophisticated ways on the world of village or even tribal myth.....It is to be grasped as a possible altarnative to the narrative logic of the contempary postmodernism.’[১৪]

এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করে উপন্যাসের প্রতিবেদন’ গ্রন্থে তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন—

‘....সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তরবাদের মহা আখ্যান যখন উদ্ধত প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা দিয়ে সমস্ত অপরতাকে পিষে মারতে— সেসময় লোকসমাজের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-বিশ্বাস-প্রত্নকথা-আদিকল্প-কিংবদন্তি দিয়ে গ্রথিত বিকল্প প্রতিবেদন অপরাজেয় জীবনের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। সুতরাং এর রাজনৈতিক মাত্রা অনস্বীকার্য। সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রম আধিপত্যবাদের ইঙ্গিতে সন্দর্ভে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার প্রতিবেদনে ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়াটি দেখা যায়। কেন্দ্রিকতার বদলে বিকেন্দ্রায়ন এবং একবাচনিকতার বদলে বহু বাচনিকতা কুহকী বাস্তবতার সম্ভাবনাকে চিনিয়ে দেয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা আমাদের পীড়িত করে, প্রতিরোধের যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুচ্চারিত থেকে যায়—সেই সবই ব্যঞ্জনার মুক্ত পরিসরে চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হয়।’[১৫]

এই উপন্যাসে অভিজিৎ রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি যে পৌর সমাজ তাকেই তুলে এনেছেন আখ্যানে। গ্রামীণ পৌর সমাজের অচলায়তন, প্রতাপের কেন্দ্র ভালোবাসার অন্তর্ঘাতে ভেঙে পড়ে। পঞ্চায়েত, পিতা মাতা, সমাজের অনুশাসন কিছুই শাসন করতে পারে না বালা এবং বিদ্যাধরীকে। তাই আখ্যানটিকে কেবল প্রেমের আখ্যান নাম না দিয়ে বলা যেতে পারে উপনিবেশোত্তর চেতনা সম্পৃক্ত এক আখ্যান। যেখানে ‘বালা ও বিদ্যাধরীর সম্পর্ক সামাজিক ও নৈতিক প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলাকে Subversive countertext বা অন্তর্ঘাতপ্রবণ প্রতিপাঠকৃতি দিয়ে প্রতিরোধ করেছে’ (পৃ.১৯০/ঐ)। আসলে তাইই তো, যেখানে অত্যাচার থাকবে সেখানে প্রতিবাদও থাকবে। সেজন্যেই হয়তো আমরা দেখি, পঞ্চায়েতের বিচারসভায় বিদ্যাধরী একটি কথাও উচ্চারণ করে না। সে এভাবে জানায় তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ বিচারসভায় বিরুদ্ধে, তার সম্বন্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে। কারণ এ ক্ষেত্রে পারিবারিক সামাজিক প্রতাপের সঙ্গে যুক্ত হয় লৈঙ্গিক প্রতাপের কণ্ঠস্বরও। বিদ্যাধরীর কোনো প্রতিবাদ বা সপক্ষাবলম্বন করে কথা কেউ আশা করেনি

এই সভায়— এমনকি যখন তাকে দান করা বিশাল সম্পত্তির কথা উঠছে তখনও। বালা যখন গুণমানের দান করা সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকার করছে তখনও কেউ বলছে না বিদ্যাধরীই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কথা, তাকে বলতে দেওয়া হোক। বালাকে বলা হচ্ছে—

> 'তোমার এসব ভাবনার দরকার কি? আর, সম্পত্তি তো কবিরাজ গুণমান বিদ্যাধরীকে দিয়া গছে তার সত্তটাই তো আসল কথা। আইজ যাও, পরে এসব নিয়া ভাবা যাবে।'[১৬]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি কথাও না বলে বিদ্যাধরীই এক দমবন্ধ পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি টানল। যে সময়টাতে বালা চূড়ান্ত অসহায়ভাবে ভারি মুহূর্তের চাপে ছটফট করতে করতে প্রায় আত্মসমপর্ণের দোর গোড়ায় সে সময় বিদ্যাধরী হঠাৎ উঠে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখানে এসে চিহ্নায়কের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে। পারিবারিক এবং সামাজিক চাপে দম আটকে আসা অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে বিদ্যা বালাকে—

> 'বালা বুঝতে পারছিল যে সে এখন ভেঙে যাচ্ছে। সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল সে যেন। বিদ্যাকে না পাওয়া এবং মায়ের সান্নিধ্য না পাওয়ার মধ্যে কোনটা এই মুহূর্তে ভয়াবহ এবং বিধ্বংসী তা নিশ্চিত করে হিসেব করতে হবে এই মুহূর্তে! এই মুহূর্তটাকে ভাঙার জন্যে এই পাথরের মত নিরেট ভারি মুহূর্তটা ভাঙার জন্যে সে একটা মানুষ খুন করতেও রাজি আছে।
>
> সবাইকে বিস্মিত করে বিদ্যা উঠে দাঁড়াল। হরিণীর মত গভীর চোখটি নিয়ে সে তির্যক একবার তাকাল তার পুরুষের দিকে। এবার বালা উঠে দাঁড়াল। বিদ্যার পিছনে খোলা দরজায় দিকে কয়েক পা এগিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল সে।....দৃষ্টি মায়ের দিকে হলেও পা দরজা পার হয়ে বাইরে।'[১৭]

একে তো বলা যেতেই পারে নবজীবন দান। কারণ এখানে কেবল সমাজ নয়, রাজকিশোর এবং মায়নোর অবস্থান আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে গ্রামসীয় তত্ত্বের সাহায্যে—

> '.....Every person, including the most powerless on the social scale, is a legislator in his or her function as parent, and thereby imposes rules and his or her underlying values on to their children.'[১৮]

অর্থাৎ পিতা মাতার অনুশাসন প্রতাপেরই একটি চেহারা। বালা সেই প্রতাপের অন্যায় অনুশাসন জালকে ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অন্যদিকে তারা 'বৈষম্যময় লৈঙ্গিক সম্পর্কের' যে চিরাচরিত সংস্কার তাকেও ভেঙে দিচ্ছে। মায়নোর বিদ্যাকে অস্বীকারের প্রধান কারণ দুটি। প্রথমটি হল সন্তানের ওপর অধিকার হারানোর ভয়, দ্বিতীয়টি হল বিদ্যার অতীত। অথচ বিদ্যার সম্পূর্ণ অতীত সে জানত না। সে কেবল জানত বিদ্যা গুণমানের রক্ষিতা। তাতেই সে বিদ্যাকে একের পর এক বাছাই করা গালি দিয়ে গেছে। কিন্তু গুণমান সম্পর্কে তার কোনো বিরক্তি ছিল না। লেখক আমাদের লৈঙ্গিক সম্পর্কের বিষম বিন্যাস দেখিয়ে দেন এভাবে—

> 'স্ত্রীলোকর স্বাভাবিক বিতৃষ্ণায় মায়নো 'বউ না হাতি' বলে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কবিরাজের উপর থেকে তার ভয়ভক্তি কিংবা বিশ্বাস কোনওটাই কমেনি।'[১৯]

অথচ এছাড়াও তো বিদ্যার অতীত আছে। সে বিদেশীর মতো এক লম্পটের সন্তান, সে ধর্ষিতা এবং শঙ্ককে সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। যদিও তা আত্মরক্ষার জন্যে। তবুও সমাজের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী কোনো সম্মানজনক স্থান তার জন্যে অবশিষ্ঠ থাকে না। নিজের না করা অপরাধের বোঝাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সবসময়ই চাপিয়ে দিয়েছে নারীর কাঁধে। সেরকমই এক সমাজে থেকেও বালা সেই সংস্কারকে কাটিয়ে উঠেছে। অচলায়তনে পরিণত সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, ট্যাবুকে অস্বীকার করে তারা যাত্রা করে নতুন সময় ও পরিসরের দিকে। জীর্ণ সমাজ বা বৃদ্ধ গুণমান যে একগাদা 'না'-এর বাঁধনের মধ্যে সামান্য স্বাতন্ত্র্য দিয়ে বেঁধে রেখেছিল বিদ্যাকে, কারোর শক্তি ছিল না তাদের রোধ করার। তাই হয়তো বা সমাজ এবং গুণমান উভয়েই একরকমের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় বিদ্যা ও বালার সম্পর্ককে। পঞ্চায়েত যেমন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তেমনি কবিরাজও যেন তাদের অভয় দিয়ে যায়। বিপদ সঙ্কুল এলুয়ার দহ পার হওয়ার মুহূর্তে বিদ্যা অনুভব করে—

> 'কবিরাজ গুণমান যেন তার জন্যই হাতখানা নদীর দিকে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে, বরাভয়ের মত একখানা হাত। চিতার উপরে আকাশের যেখানে আলো পৌঁছায় না, সেখানে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নীল রহস্যময় আলো।'[২০]

আবার বর্ণনার ঢঙেই দেখছি বাস্তবে মিশে যাচ্ছে রূপক, প্রত্নকথার দ্যোতনা, আলো ও অন্ধকারের দ্বিবাচনিকতা। এই নিগূঢ় দ্বিবাচনিকতা কাজ করেছে প্রতিটি কুশীলবের মনে, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির আকরণে এমনকি যৌন আকাঙ্ক্ষায়ও। এভাবে বাস্তবের মধ্যে কুহক, আবার কুহকের মধ্যে বাস্তবতা প্রবেশ করে বা বলা যায় একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ফলে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য প্রতিবেদনকে চিহ্নিত

করেছেন কুহকের বাস্তবতা বলে। মূলত অভিজিৎ সেনের লেখন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় তা দিয়ে। তাই তাঁর উপন্যাসে সাপ একটি সাধারণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি নিজে একটি অপ্রকাশিত রচনায় লিখেছিলেন যে তীব্র ,তীক্ষ্ণ, দ্যুতিময় গর্বিতভঙ্গি নিয়তির মতো অমোঘ নির্ঘাত মৃত্যু ঈশারার মতো অতর্কিত এবং রহস্যময় সাপ কোন্ লেখককে না আকৃষ্ট করে ? আলোচ্য আখ্যানেও সাপ এসেছে ঠিক নিয়তিরই মতো—

> 'যেন শংকর নিয়তি অথবা বিদ্যার নিয়তি অথবা কবিরাজের নিয়তি তাকে পাঠিয়েছিল তাকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে। সে সেই কাজটি শেষ করে এখন চলে যাচ্ছে।'[২১]

সাপের কামড়ে শংক মারা যায়, কিছুদিন পর সন্ধ্যেবেলায় গোয়ালঘরে বিদ্যা মৃত শংককে দেখতে পায় এবং হ্যালুসিনেশনের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার গর্ভপাত হয়। আর তারপর একটি সন্তানের কামনায় কবিরাজের ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৃদ্ধ কবিরাজকে আরো দ্রুত মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় এবং বিদ্যাধরী ও বালার জীবনের একটি অসীমাংসিত সমস্যার সহজ সমাধান নির্ণীত হয়। এতোগুলো জীবন এই একটি ঘটনা বা আরো নির্ধারিতভাবে বললে একটি সাপ প্রভাবিত করেছে কতো বিচিত্রভাবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় লৌকিক বিশ্বাসে সাপকে প্রজননের প্রতীক ধরা হয়। তাই অনেক জায়গায় মনসা মূর্তির কোলে একটি শিশুপুত্রও দেখতে পাওয়া যায়। মনসার কাছে প্রার্থনা করে সনকার পুত্র লাভ হয়েছিল, এ আখ্যানে মায়নোমতিরও হয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখি সাপের শঙ্খ লাগার প্রসঙ্গ থেকেই বালা ও বিদ্যা শুনতে পায় যেন একে অপরের শরীরী আহ্বান অর্থাৎ অভিজিৎ সেন এখানে লৌকিক সংস্কারকেই কাজে লাগিয়েছেন।

আখ্যানটিতে এছাড়াও মিশে যায় লোকবিশ্বাস, যৌথ নিশ্চেতনায় অভিব্যক্তি। তাই পাপ পুণ্যের প্রসঙ্গে এসে পড়ে মনসামঙ্গলে বর্ণিত চাঁদ সওদাগর পুত্র লখিন্দর কর্তৃক তার মামি কৌশল্যাকে ধর্ষণ আবার এখানে উল্লেখ করা হয় রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক মামি ভাগ্নের সম্পর্ক ছিল। এছাড়া উপন্যাসের শেষে রাজকিশোর যেভাবে বালাকে দেখছে তা কেবল মাত্র পিতার স্নেহাভিষিক্ত দৃষ্টি নয়, সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য সেখানে দেখতে পেয়েছেন যৌথ নিশ্চেতনার অভিব্যক্তি। উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> 'রাজকিশোর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার ছেলেকে। ঋজু শালবল্লার মত দেহকাণ্ড তার লখাইয়ের। আর কি মানিয়েছে দুজনকে, যেন সত্যিই বেহুলা লখিন্দর, যদিও ঝড়ে বিধ্বস্ত, আক্ষেপে বিপর্যস্ত তার লখাই।'[২১]

অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ আখ্যান যেহেতু লোকায়ত মানুষদের নিয়ে রচিত তাই তাদের ধর্ম বিশ্বাস লোকায়ত সংস্কার কিছুই আখ্যান থেকে বাদ যায় না। মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ন-মারণ বশিকরণ, যাদু-টোনা, দৈবমাদুলি আংটি, পাথর, ডাইনি সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলিকে আখ্যানে আনেন লেখক। লোকায়ত মানুষের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবন যেহেতু প্রায় পুরোটাকেই জড়িয়ে থাকে ধর্ম ভাবনা তাই আখ্যানেও দেখি লেখককে সেরকমটাই আঁকাড়া তুলে আনতে। যেমন মনসার কাছে মানস করে যে সন্তান পাওয়া গেছে তার নাম হয় বালা লখিন্দর তার বাড়িতে সাপ মারা নিষেধ। কালী ও ধর্মের অবৈধ সন্তান মাশনা কালীর বাস এলুয়ার দহে। তার হাত থেকে বালা রক্ষা পেলে কালীর স্থানে পূজো দেয় মায়নোমতি। আবার বিষ্ণুপদ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে উত্থানের জন্য কবিরাজের ভূমিকাকে মান্যতা দেয়। কবিরাজ একাধারে গুণমানও বটে, ডাইনি চিহ্নিতও করে আবার চিকিৎসাও করে। লেখক যখন এ বিষয়গুলো আখ্যানে সন্নিবেশিত করেন তখন তিনি মোটেও মধ্যবিত্ত সুলভ নাসিকাকুঞ্চনসহকারে এগুলো তুলে ধরেন না। বিচার করেন যুক্তি দিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে, কেন আছে এসব বা বলা ভালো কেন থাকে এসব সংস্কার। তাঁর নিজের ভাষায়—

> ‘সাপের কামড়ে ওঝার শরণাপন্ন হওয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রির গলায় সাপ এবং মুখে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ন- মারণ-বশিকরণ-ডাইনি- যাদুটোনা- দৈবমাদুলি- আংটি- পাথর এসব শুধু লোকায়ত বিশ্বাস নয় বোধহয়। উচ্চতর শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সমাজও তো এসব বিশ্বাস বা আবেগ থেকে মুক্ত নয়। বরং আমার তো এক এক সময় বলতে ইচ্ছা হয় যে মন্ত্রতন্ত্র, ওঝালি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, ভূতপ্রেত পরি—এসব আমাদের সত্যি সত্যিই আছে। আছে মানে আরো পরিষ্কার করে আমি বলতে চাই, হ্যাঁ ....বালা কালমাশনার কোনো হরিণার দহে ঘুর্ণিপাকে পড়লে কবিরাজ গুণমান মন্ত্রপড়া ধুলো ছুড়ে তাকে উদ্ধার করে।
>
> ... ...
>
> যুক্তিবাদী হাজার চোখে আঙুল দেওয়া বক্তৃতা সত্ত্বেও ধর্মশাস্ত্রের দৃঢ়প্রাচীর চুরমার করা, বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার সত্ত্বেও ধর্ম এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তেমন জোরদার কোনো আঘাত সম্ভব নয়। নিষ্ঠুর পৃথিবীর হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের কাঁদার জায়গা হিসাবে এসব থাকবে। সময় সময় দিশেহারা ব্যক্তি মানুষ ডাইনি নিধন কিংবা বালক বলির মতো নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। এর জন্য দোষী যদি কাউকে করতেই হয়,

তা হলে সমাজব্যবস্থাকেই করতে হয়।'[২৩]

তাই অভিজিৎ সেনের আখ্যানে ব্যবহৃত উপাদানগুলি একাধারে লৌকিক এবং অতিলৌকিক। লোকায়ত মানুষের ধর্মবিশ্বাস, তাদের আচার ব্যবহার সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য সবই ছদ্ম বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক হাতিয়ারের মতো ব্যবহৃত হয়েছে যেন আখ্যানটিতে। আর বিশেষত লেখকের অন্বিষ্ট লোকায়ত এই মানুষগুলোর চরিত্র তাঁর নিজের মনে হয়েছে এভাবেই যথার্থ অনুধাবন করা যায়। লেখক জানান—

> 'আমি লোককথার আখ্যানও উপন্যাসে নানাভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ আখ্যানের চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য—তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে এসবও আমি উপন্যাসে আনি।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজ প্রকৃত মানুষের যে খুঁটিনাটি নিখুঁত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা প্রধানত তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ। সত্তরের দশকের রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে গ্রাম বাংলার অন্দরমহলে প্রবেশ। তারপর চাকুরিসূত্রে জীবনের একটি বড়ো সময় তাঁর কাটে উত্তরবঙ্গে। তিনি লিখেছেন—

> 'দিনাজপুর এবং মালদা এমন এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেখেছি, যে কোনো গল্প কথকের কাছে তা ঈর্ষণীয় হতে বাধ্য। দেখেছি মুর্শিদাবাদকেও। ....'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দরে'র বিদ্যাধরী লখিন্দর মায়নোমতি কবিরাজ গুণমান এবং এরকম আরো অসংখ্য মানুষকে আমি দেখেছি তাদের স্বক্ষেত্রে, তাদের ইতিহাস ভূগোল এবং পরম্পরার মধ্যে বহু বছর ধরে দেখেছি।'[২৪]

ফলে লেখক যখন এই চরিত্রগুলির মুখে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেন তাও হয় যথাযথ। কুশীলবেরা সজীবতর হয়ে ওঠে এর ফলে।

ডেভিড দাবিদিনকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি ডেরেক ওয়ালকট বলেছিলেন—

> 'Ordinariness is not a common quality in art. I don't mean banality, nor do I mean conscious illumination of an object to give it a dignity that it doesn't really have.'[২৫]

তাই কলকাতাবাসী কানাই দীর্ঘকাল গ্রামে বাসের ফলে সমাজ ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে

নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কথা বলে উত্তরবঙ্গীয় বাচনভঙ্গিতে। প্রথমে যে শহরাগত কানাই গ্রামের কিছুই জানত না, রীতি-রেওয়াজ-ভাষা— সে বলেছে—

> ‘যে নিয়ে যাবে, তারই বাড়িই যাব, কুটুম হব।’[২৬]

যে জানত বসুধৈব কুটুম্বকম্, জানত না গ্রামের ধারণায় কুটুম মানে বৈবাহিক। দীর্ঘ গ্রামবাসের পর সে বলে—

> ‘বিহা হইলে বেটি শ্বশুরবাড়ির আর বেটা বেটা বউয়ের— এলা কি আপনে জান্নেন না?’[২৭]

বাচনভঙ্গিতে, আচারে ব্যবহারে—অভিজিৎ সৃষ্ট এই কুশীলবেরা আমাদের অজ্ঞাত অপরিচিত এক জগৎকে তুলে ধরলেও তাদেরকে আমাদের খুব অপরিচিত মনে হয় না। এর কারণ হিসেবে লেখক স্বয়ং বলেন যে বালা লখিন্দর বিদ্যাধরী প্রভৃতি চরিত্রগুলোর মধ্যে এক এক ধরনের আর্কিটাইপ বা আদিকল্প রয়ে গেছে। আর এই আর্কিটাইপ আমাদের সবার মনের মধ্যে ভ্রূণকারে সঞ্চিত থাকে। সে কারণেই কুশীলবেরা হয়ে ওঠে পরিচিত। লখিন্দরের চরিত্রে মঙ্গলকাব্য মিথ যেমন জেগে ওঠে তেমনি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় আদর্শ প্রেমিকের ছবিটি। আবার পুত্র হিসেবেও সে তার জীবনের প্রথমাংশে বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে আদর্শ ছিল। যদিও বিদ্যার প্রতি দায়িত্ববোধ তাকে বাবা-মার বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করে। আবার বিদ্যার চরিত্রে দেখি natural goodness। সে লখিন্দরকে ভালোবাসলেও কবিরাজের প্রতি মমতাবান। তাই কবিরাজের জীবিতাবস্থায় তাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবেনি।

আবার কানাই-এর মতো চরিত্রকে আমরা এ আখ্যানে পাই যার আসল নাম কেউ জানে না। শহরের জীবনের অতিষ্ঠ হয়ে সে নিজের অতীতকে পেছনে ফেলে চলে এসেছে নতুন ভবিষ্যতের সন্ধানে। স্বল্প পরিসরের এই ক্ষুদ্র চরিত্রটির মধ্যে মানব স্বভাবের গোপনে রয়ে যাওয়া প্রকৃতি সংলগ্নতাই বুঝি বা প্রকাশিত হয়। আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা থেকে সরে এসে শেকড় সন্ধানের প্রবণতাকেও তো কানাই চরিত্রটি চিহ্নায়িত করে।

এভাবে অভিজিৎ সেন সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিকদের থেকে ভিন্ন পথ ধরে হেঁটে আবিষ্কার করেছেন তমসাবৃত কিছু পরিসর যেখানে সম্ভাবনা প্রচুর কিন্তু ছিল অকর্ষিত। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের যে লিখন শৈলী ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা এবং রচনা প্রকাশের বিপরীতে আয়ুধ শাণিত করেছে সেই লিখন শৈলী ব্যবহার করেছেন অভিজিৎও। যদিও এ উপন্যাসে তাঁর শৈল্পিক প্রবণতা ও জীবন দর্শন কোনো নতুন পথের সন্ধানে অগ্রসর হয়নি, তবুও একথাও অনস্বীকার্য যে—

'উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের অনাবিষ্কৃত প্রায় অন্ধকার পরিসরে যেভাবে তিনি আলোকসম্পাত করে চলেছেন, তার তুলনা বিরল। সবচেয়ে বড়ো কথা, লোকায়ত ব্রাত্য সমাজের কথা তৃতীয় বিশ্বে প্রাগ্রসর সৃষ্টি চেতনার উপজীব্য হয়ে উঠেছে—এর তাৎপর্য সামান্য নয়।'[২৮]

রহু চণ্ডালের হাড়

১. দেবেশ রায় সম্পাদিত, জীবনানন্দ সমগ্র, জন্মশর্তবর্ষ সংস্করণ, গল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৩, জানুয়ারি-২০০৩।

২. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা, ভারবি, কলকাতা-৭৩, নবম মুদ্রণ, জুন, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৩১।

৩. বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদ প্রয়াস, অভিজিৎ সেন সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪।

৪. তদেব, পৃষ্টা-২৯

৫. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৪৯৫।

৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩ দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-২২৫।

৭. বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদ প্রয়াস, অভিজিৎ সেন সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-২৯।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯-৩০।

৯. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৬৭।

১০. এক্ষণ ১৫শ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮২, (নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাস বিদ্যার দায়িত্ব রণজিৎ গুহ), পৃষ্ঠা-১৪-১৫।

১১. অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১৭।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬।

১৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৬৯।

১৪. হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।

১৫. বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত সম্পাদিত এবং মুশায়েরা, উপন্যাস বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৬. অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১৬।

১৭. অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৪৪।

১৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৭৩।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১।

২০. তপোধীর ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ ঞ্জ কবিতার সংকেতবিশ্ব, প্রতিভাস, জানুয়ারি, বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪২।

২১. তপোধীর ভট্টচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৭৫।

২২. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা-২৭৭।

২৩. গ্যাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজ, নিঃসঙ্গতার একশ বছর, সন্দেশ, ঢাকা-১০০০।

২৪. হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১২০।

২৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, দীপাবলি ২০১০, পৃষ্ঠা-২৩৯-২৪০

২৬. অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ পৃষ্ঠা-৫৫।

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪।

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০।

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৩।

৩০. তদেব পৃষ্ঠা-২১৩।

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৩।

৩২. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা-২৮৬-২৮৭।

৩৩. পুলক কুমার সরকার সম্পাদিত, শুভশ্রী, ৪৫ সংখ্যা, ২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-১২৩।

৩৪. অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৪১।

৩৫. পুলক কুমার সরকার সম্পাদিত, শুভশ্রী, ৪৫ সংখ্যা, ২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৭।

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩২।

৩৭. বিকাশ শীল সম্পাদিত, জনপদপ্রয়াস, জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৪৫।

৩৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, দীপাবলি ২০১০, পৃষ্ঠা-২৪৮।

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর

১. Michael Holquist, Dialogism (Baktin and his world), Routlodge London, first Published 1990. Page-72.

২. তপোধীর ভট্টাচার্য, বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি, মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭১।

৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০।

৫. Ed. Caryl Emerson, Problems of Dostoevosky's Poetics. M.M. Baktin. Manchester University Press, 1984. Page-287.

৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৭৫।

৭. অভিজিৎ সেন, বিদ্যাধর ও বিবাগী লখিন্দর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮।

৯. দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি-২০০৬, পৃষ্ঠা-২১।

১০. অভিজিৎ সেন, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৭৬।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯।

১৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯১।

১৪. Fredric Jamson, The Political Unconscious, Methuen, London, 1992, Page-128-129. (1st Published is 1986).

১৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪১।

১৬. অভিজিৎ সেন, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-১৪।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

১৮. Robert C. Holub, Reception Theory, Routledge, London, 2nd Edition 1990, Page-200.

১৯. অভিজিৎ সেন, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১৮।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৭২।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫।

২৩. বিকাশ শীল , সম্পাদিত, জনপদ প্রয়াস, জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা১০-১১।

২৪. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা-১০৬।

২৫. Wasafiri, 20th Annual Issue, Page-40.

২৬. অভিজিৎ সেন, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ পৃষ্ঠা-৭৯।

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩।

২৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯১।